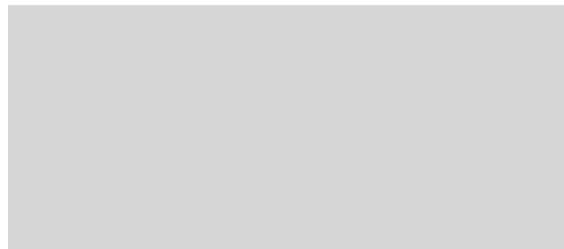


নবদিশা

শিক্ষাগণে নতুন দিশার সন্ধান



সংকলন ৮। ■ ডিসেম্বর ২০১৫



নবদশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধান

সংকলন - ৮ | ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পাদকীয়

ধর্ম কি শিক্ষার বাইরে

আমরা অনেকেই মনে করি শিক্ষা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত। কিন্তু শিক্ষার যেমন একটা সামাজিক দিক আছে, একটা সাংস্কৃতিক ভিতও আছে। যেগুলো প্রতীকী বা প্রতীকমূলক (আত্মিকতা, মূল্যবোধ, ধর্ম, ধর্মীয়বিধি, আচার অনুষ্ঠান), সেগুলো শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করার জন্য প্রয়োজন।

প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী দেখা যায় যখনই পৃথিবীতে অশান্তি অনাচার বা অনাসৃষ্টি দেখা দিয়েছে তখনই দিশেহারা মানুষকে কল্যাণের পথে চালিত করার উদ্দেশ্যেই নানা ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। পাশাপাশি কল্যাণময় জীবন যাপনের জন্য কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে। যেটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক সেটা হল পৃথিবীতে নানা ধর্ম নানা মত থাকলেও সবার মর্মবাণী এক-জগৎ ও জীবনের কল্যাণসাধন। আর মধ্যযুগে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ধর্মশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটা নৈতিক ভিত্তি তৈরি করা। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। তার কারণ যাতে আগামী প্রজন্ম বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণী গুলো বুঝতে পারে এবং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে শেখে ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরিত হয়।

তবে জরুরী কথা হলো এই যে ধর্মীয় দর্শন বা জীবনের আত্মিক উপলক্ষের থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আলাদা করে বুঝতে পারাটাও দরকার। জগতকে সামগ্রিকভাবে দেখার কথা সব ধর্মের মধ্যেই বলা আছে। এই মূল্যবোধ জ্ঞান লাভের এবং সমাজে মানুষের একসাথে মিলেমিশে থাকার মূলভিত্তি। এখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে এসে আগামী প্রজন্ম কি করে প্রতিটি ধর্মের মূল বাণী উপলক্ষের সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধকে সদা জাগ্রত রাখতে পারে, তার উপযুক্ত পদক্ষেপ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই গ্রহণ করা জরুরী।

সূচীপত্র

১। আদর্শ শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ- স্বপন কুমার ঘোষ	১
২। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ.....	৩
৩। শিক্ষার অর্থ- কে কে খুল্লার	৬
৪। সময়ের অগ্রগতির সাথে শিক্ষার অগ্রগতি	৮
৫। গণশার চিঠি- লীলা মজুমদার	৯
৬। আমার গ্রাম ও গ্রামের ইতিহাস	১০
৭। সেই সময় - কুচবিহার	১১
৮। নতুন পথের যাত্রী আরতি ...	১৪
৯। বিদ্যালয়-স্তরে কৃষিশিক্ষা প্রসঙ্গে একটি.....	১৫
১০। বাংলা প্রবাদে প্রতিবিম্বিত কৃষি-সাংস্কৃতিক.....	১৬
১১। বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা- মারিয়া মণ্টেসরি	১৭
১২। এসো তাঁদের গল্প শোনাইঃ কবীর	১৯
১৩। ইয়ং ইন্ডিয়া	২০
১৪। নষ্ট তালিম এবং গান্ধীজী শিক্ষা ভাবনা	২১
১৫। সৃজন মেলাঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫	২২
১৬। শান্তিনিকেতনে আলোচনা ও ভাবনার বিনিময়	২৪
১৭। কালচিনির সারাদিনব্যাপী আলোচনা ও ভাবনার...	২৫
১৮। আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার লাইফ	২৭
১৯। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫.....	২৮
২০। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার	৩০
২১। বিদ্যালয়ে প্রদর্শনযোগ্য অডিও-ভিসুয়াল উপাদান	৩১

আদর্শ শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

- স্বপন কুমার ঘোষ

কবি বললেই ভাবকল্পনায় উদ্দীপিত এক মানুষকে বোঝায়। আবার কবি ভাবলেই এক নিমগ্ন কল্পনাসেবী-কে মনে পড়ে। শিক্ষক বললেই মনে ভাসে শিক্ষাদানে আগ্রহী, ছাত্রচেতন জনৈক ব্যক্তিত্বকে। অনেক কবি কল্পনা করতে পারেন, অনেক সময় ছাত্রদের বোঝাতে পারেন না। কবি কি শিক্ষক হতে পারেন? শিক্ষক কি কবি? হ্যাঁ, দুয়েরই উদাহরণ দেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বিরল প্রতিভার একজন। যিনি একাধারে রচয়িতা, স্রষ্টা, আবার অন্যদিকে প্রজ্ঞাপ্রসারী আদর্শ শিক্ষক। কবি-শিক্ষকদের যে দুর্লভ ঐতিহ্য সারা পৃথিবীতে আছে, নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। শিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-কে পাওয়া যে কোনো মানুষের জীবনে এক দুর্লভ, বিরল, অনিন্দ্যকান্তি অভিজ্ঞতা।

জীবনবৃত্তান্ত সূত্রে সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন প্রচলিত শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে কবির বিদ্রোহী সত্তা মুক্তি চাইছিল নাগরিক জীবনে গৃহগত বন্দিত্ব থেকে। সে কারণে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি দেখেছেন খন্ডিত, অসম্পূর্ণতা। এসব তাঁর কাছে বিরস মনে হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রভাবনা ছিল, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানবমনের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাভাবিক বিকাশ। ছাত্রদের জীবনকে বিকশিত করবার ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিচিত্র সাহচর্য – রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনার অন্যতম কথা।

ওপার বাংলায় কবি যখন জমিদারির সব কাজকর্ম দেখছিলেন, সে সময় প্রকৃতি-ই চারদিক থেকে মুক্ত পরিবেশের আস্থান জানিয়েছিল তাঁকে, কবি-ও সেই আস্থানে আন্তরিক ভাবেই সাড়া দিয়েছিলেন। কলকাতার যান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশে শুধু অন্য বাড়ির ছেলেদের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচটি সন্তানকেও তাঁদের জমিদারি শিলাইদহের ‘গৃহবিদ্যালয়ে’ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। শিলাইদহে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার বিষয়ে তাঁর সরাসরি প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, একথা বলা যেতে পারে।

শিলাইদহে পতিসরের পল্লী অঞ্চলের জমিদারি পরিচালনার কাজে বিভিন্ন দিকে ব্যস্ত থেকেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এখানে গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষাদানের চেষ্টা হলেও এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সামগ্রিক ও যথার্থ হয়ে উঠতে পারবে না।



শান্তিনিকেতনে চিত্রাঙ্কনে স্তম্ভসমূহ স্থাপন করছেন।
সেখানে: স্তম্ভসমূহ স্থাপন করছেন।

সেকারণে তাঁর বিদ্যালয় - ভাবনা ও শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী কবি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার কথা অন্তর থেকে ভাবছিলেন। সেটি হবে এদেশে নতুন ছাত্রদের মনোবিকাশের উপযোগী। তিনি সেইসময় থেকেই শিলাইদহের এই গৃহ বিদ্যালয়টিকে সমাজের আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশদভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন।

‘সব পেয়েছির দেশ’ শান্তিনিকেতন হয়ে উঠল রবীন্দ্র শিক্ষা-স্বপ্নের একটি

আদর্শকর্মক্ষেত্র। শান্তিনিকেতন – আশ্রমের নির্জন নিভৃত পরিবেশে প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শে সীমাহীন আনন্দের স্রোতের শিক্ষা যাতে উদার মনোভাব গঠনে সহায়ক হয়, তার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ তাঁর মনে বেশ তীব্র হয়ে উঠল।

সময়টা তখন স্বদেশীর যুগ। ইংরেজি স্কুলের পরিবর্তে একটি স্বদেশী ধাঁচের বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জরুরী প্রয়োজন ও আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আর এর সঙ্গে তাঁর ভাবনাবৃত্তে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বয়ের পাঠ্য ও অন্যান্য চারুকলা শিক্ষার ভাবাদর্শ। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আকাশ ভরা কোলে ছাত্ররা হয়ে উঠুক ‘পূর্ণ মানুষ’।

আদর্শ শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষা সংগঠক রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তৈরি প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে – শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। ১৯০১ সালের বাইশে ডিসেম্বর, ১৩০৮ বঙ্গাব্দের সাতই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরের সাংবাৎসরিক উপাসনা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বাল্য জীবনের শিক্ষার ‘অভিজ্ঞতা বড় তিজ্ঞ’। কবির কথায় – ‘মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত’। সেকারণে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ‘মাস্টার’ নির্বাচন করবার ক্ষেত্রে সব সময় ছিলেন সচেতন। কবির শিক্ষকতা জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি শিক্ষক চিনতে ভুল করেননি। তাঁর শিক্ষাদানের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল – প্রকৃতি।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ও পরিচালনার কাজে কয়েকজন আদর্শবাদী শিক্ষক-কে নিকট-সঙ্গী ও সহকারী হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, রেবাচাঁদ (অনিমানন্দ) প্রমুখদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতন। হয়তো এঁরা কেউই পেশায় শিক্ষক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা আর বিশাল অনুরাগ। বলতে গেলে, একমাত্র কবির টানেই তাঁরা

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সব নিষ্ঠাবান এবং আদর্শবাদী শিক্ষকমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি আবার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের কথা ভেবেই ছাত্রদের পড়াবার জন্যে নিজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলায় নতুন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-র, সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম ‘সংস্কৃত শিক্ষা’ নামে দুটি খন্ডে একটি সংস্কৃত বই লেখেন। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার পর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে ‘সংস্কৃত প্রবেশ’ বই রচনা করেন। যে-সময় শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তখন দেশে ইংরেজি পাঠ দেওয়ার উপাদান খুব একটা বেশি ছিল না। কবির পক্ষে সংগ্রহ করাও কঠিন ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর ভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ডিরেক্ট মেথড বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ইংরেজি পড়াবার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

১৯০৪ সালের মে মাসে কবির লেখা ‘ইংরেজি সোপান’-এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এর দু’বছর বাদে ১৯০৬ সালের জুন মাসে এই বইটির দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ পায়। ‘ইংরেজি সোপান’ বইটি প্রকাশিত হবার পর কোচবিহার থেকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথ-কে লেখা এক চিঠিতে বই সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় কবির এই প্রচেষ্টাকে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন।

‘ইংরেজি সোপান’ গ্রন্থ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ কবি-কে লিখেছিলেন – “আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত – Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাপুস্তক প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।”

তিনি ইংরাজি পাঠ লেখেন ১৯০৯ সালে। আঠারটি পাঠে সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষককে পঠন-পাঠন, রচনাকার্য আর অনুশীলনে নিয়মিতভাবে উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁদের লেখা বইয়ের নামকরণ করেছেন। যেমন, ১৯২২ সালে ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকের নাম তিনিই রেখেছিলেন – ‘ভূ-পরিচয়’।

কবি যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন, নানান ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বিদ্যালয়ের ক্লাশ নিতেন। আর পড়ানোর ফাঁকে ছাত্রদের জন্য নতুন মজার খেলা আবিষ্কার করতেন, ইন্দ্রিয়বোধ চর্চাও করাতেন।

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পড়াতেন, সেকথা জানতে পারি কবি-

কন্যা মীরাদেবী-র অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণায় ‘স্মৃতিকথা’ বইটিতে। মীরাদেবী লিখেছেন – “..... বেশির ভাগ সময় গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে বেছে বেছে কবিতা পড়াতেন। আমি ভালো মুখস্থ করতে পারতুম না কিন্তু বাবা সুন্দর উপায়ে মুখস্থ করিয়ে দিতেন। যেখানটা আমার মনে পড়ত না সে জায়গার কবিতার ছবিটা মনে করিয়ে দিতেন, তখন আস্তে আস্তে সবটা মনে পড়ে যেত। যে কবিতাটি মুখস্থ করাতে চাইতেন সেটা বার কতক লিখতে বলতেন; লিখতে লিখতে আপনি মুখস্থ হয়ে যেত। ক্রমে আমাকে টেনিসন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কবিতা, সোরাব ও রুস্তমের কাহিনী, তারপর এনক আর্ডেন ইত্যাদি ইংরেজি সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

আমরা প্রায় সকলেই একথা জানি যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে সাহিত্যের সঙ্গে বহুবিধ শিক্ষার পঠন-পাঠনের আয়োজন হয়েছিল সে-যুগে। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেসময় বিভিন্ন ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব লেখা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, সেই সব বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কবি নিজে ‘মার্ক’ করে জগদানন্দ রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ছাত্রদের সেইসব লেখা জগদানন্দ বাংলায় বুঝিয়ে দিতেন।

শান্তিনিকেতনের সীমাহীন আকাশ পরিষ্কার থাকলে গৌরপ্রাঙ্গণে টেলিস্কোপের সাহায্যে জগদানন্দ রায় ছাত্রদের গ্রহ-নক্ষত্রদের সঙ্গে বিশদভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ছাত্রদের গণিত শেখাবার বিষয়দে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ছাত্রদের গণিত শেখাবার বিষয়ে কবি তাঁকে নানাবিধ উপদেশ দিয়েছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিক্ষাদর্শের পথ প্রবর্তক। শিক্ষাকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন তা সারা পৃথিবীতে মুক্ত শিক্ষায় এক অনন্য পদ্ধতি হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা তথা শিক্ষকের ভূমিকা একান্ত অভিনব। যাঁরা তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা মুগ্ধ। তাঁরা সকলেই ভাষাকুলতায় একথা অকপটে জানিয়েছেন যে, এর কোনো তুলনা নেই। সাহিত্যের বিবরণে আকর্ষণীয় করে ছাত্রমনে তা গেঁথে দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর – যা সার্থক শিক্ষকের একটা গুণ। আর চলতে চলতে, গাইতে গাইতে খেলাচ্ছলে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ করে তুলেছিলেন ভারমুক্ত, আনন্দময় – যার দ্বিতীয় উদাহরণ আর নেই।

দেশের মানুষের ও পরিবেশের চরিত্র অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি তৈরি হওয়া দরকার।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশের সংকলন

রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক চিন্তাবিশ্বের বৈচিত্র্যময় ভুবনে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষত শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি যে ব্যতিক্রমী এবং বিকল্প শিক্ষার অনুশীলনে নিজেকে ব্যাপ্ত-সম্পৃক্ত রেখেছিলেন, তা আজকের পরিব্যাপ্ত ভাঙন এবং অবক্ষয়ের যুগে শুধু নতুন করে চর্চার দাবি রাখে তাই নয়, বরঞ্চ বর্তমান সমাজ-প্রেক্ষিতে যদি সীমাবদ্ধ পরিসরেও তার প্রয়োগ করা যায়, তবে তাই হবে মানবসভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান চিন্তাপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম এবং দায়বদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। যদিও শুধুমাত্র কিছু উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবনার গভীরতা স্পর্শ করা যাবে এই রকম আশা করা নিতান্তই বাতুলতা, তবু আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এগুলি পাঠ করে শিক্ষক অথবা শিক্ষা পেশাজীবীবৃন্দ মূল প্রবন্ধগুলি চর্চায় এবং তাঁদের প্রতিদিনের কর্মভূমিতে তার প্রয়োগে ব্যাপ্ত হবেন। কারণ শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক ধূসরতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সুস্থায়ীত্ব ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এখানে উদ্ধৃত সমস্ত রচনাংশ বিশ্বভারতী প্রকাশিত “শিক্ষা” প্রবন্ধ সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে (ভাদ্র ১৪১৭ সংস্করণ)।

“এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন আবাস্তব।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষার বিকিরণ

“অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না - বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

“বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্তই আবশ্যিক তাহাই কঠিন করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যিক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

“আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদিবা ভাবগুলো একরূপ বৃদ্ধিতে পারি, কিন্তু সেগুলোকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের

“আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদের জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা - আমাদের সুহৃৎ বন্ধু - আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী - আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা - আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী শ্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বৃষ্টিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যিক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদেরকে কেবলানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দূকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দূকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপোরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যসম্ভবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায্য। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষার হেরফের



“মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়বার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে -একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।”

প্রবন্ধঃ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

“সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।”

প্রবন্ধঃ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

“ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্ক পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্ক দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বলাইবার সাধ্য তাহার নাই।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

“দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটি এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।”

“শিক্ষাসমস্যা” প্রবন্ধ থেকে

“পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে - মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয় - তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আবস্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

“যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যিক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহাৰ্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

“লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো জোর একটা প্রাইভেট টিউটর রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ ‘লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই’ শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি এক-প্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষাসমস্যা

“মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনো-মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা



পোলিটিক্যাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কী আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্রে হইতে মহাসতোর কোন মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল -

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,

ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদের পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।”

প্রবন্ধঃ জাতীয় বিদ্যালয়

“শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখন সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখন সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষাবিধি

“তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইন্সকুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেসনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে’ এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদেরকে বোঝায় না, আমাদের ইঙ্কুলেও এ শিক্ষা নাই।”

প্রবন্ধঃ লক্ষ্য ও শিক্ষা

“আমাদের বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইঙ্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।”

প্রবন্ধঃ লক্ষ্য ও শিক্ষা

“আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই

আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইঙ্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?”

প্রবন্ধঃ বিদ্যার যাচাই

“শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এনলাইটেন্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইঙ্কুলের বেষ্টিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্ত্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে।”

প্রবন্ধঃ শিক্ষার বিকিরণ

হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌরব দাও

দুঃসাধের নিমন্ত্রণে

দুঃসহ দুঃখের গর্বে।

টেনে তোলো রসাত্ত ভাবের মোহ হতে।

সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধুলায় লুষ্ঠন।

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে

মানবমর্যাদাবিসর্জন,

চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারশি

নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে

মস্তক তুলিতে দাও

অনন্ত আকাশে

উদাত্ত আলোকে,

মুক্তির বাতাসে।

প্রবন্ধঃ ছাত্রসম্ভাষণ

বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো,
মানুষের যা কিছু দামি এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষার অর্থ

- কে কে খুল্লার

লেখক পরিচিতিঃ কে কে খুল্লার হলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক। শিক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় রচিত তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধগুলি পাঠকসমাজে সুবিদিত। এই প্রবন্ধটি হল তাঁর রচিত The Meaning of Education প্রবন্ধের বাংলা ভাবানুবাদ।

শিক্ষা হল চরিত্র গঠনের একটি অন্যতম পদ্ধতি। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয় সুদৃঢ় মন এবং প্রসারিত হয় প্রখর বুদ্ধি বা মেধা। এপ্রসঙ্গে একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রবাদ হল - শিক্ষা ব্যতীত একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিং ও লেজহীন একটি পশু। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে শিক্ষা ব্যতীত একজন মানুষ পৃথিবীতে বোঝা মাত্র এবং সমাজের বুকে পরনির্ভরশীল বা পরজীবী ছত্রাকের মত। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অহিংস এবং সর্বোপরি শোষণহীন সমাজ ও অর্থনীতির ধারাকে প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি উপায়।

ডঃ রাখাকৃষ্ণ একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষ মানেই তিনি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াবান এমন নয় বা ইউরোপীয়

একজন ভারতীয় আদর্শ
মানুষ তাঁকেই বলা যায় যিনি মুক্ত মনের
মানুষ এবং যিনি এই মহাবিশ্বকে তাঁর
অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন

মধ্যযুগের অতি সাহসী নাইটও নয়, বরং একজন ভারতীয় আদর্শ মানুষ তাঁকেই বলা যায় যিনি মুক্ত মনের মানুষ এবং যিনি এই মহাবিশ্বকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, সেই সঙ্গে স্থান কালের গণ্ডি থেকে যিনি নিজেকে মুক্ত করেছেন বা স্থান কালের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যিনি আবদ্ধ নন। ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী শিক্ষাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় ও দর্শনগত চিন্তা থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় জ্ঞানের যাচাই ও গুরুর প্রতি শিষ্যের বিরুদ্ধতা প্রদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। গুরু-শিষ্য পরস্পরা বা ঐতিহ্যের মধ্যেও দেখা যায় যে গুরুর জ্ঞানদানের বিষয়ের প্রতি শিষ্য নিজের মতামত প্রকাশ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন গৌতম তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে অষ্টমার্গ (আটটি পথ) অনুসরণ করার কথা বলেন, তখন গুরুর এই নির্দেশকে আনন্দ প্রত্যাখ্যান করেন এবং গুরুর নির্দেশিত অষ্টমার্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। একইরকম ভাবে দেখা যায়, রাজপুত্র রাজা মান সিং দীন ইলাহি মেনে চলতে অস্বীকার করেন এবং তা সত্ত্বেও সম্রাট আকবরের অধীনে রাজা মান সিং বহাল

তবিয়েতে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি ঐতিহ্য।

এমনকি সাম্প্রতিককালেও স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস যুবক বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে একদা যেন তাঁকে অনুসরণ করা না হয় এবং শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তিনি সত্য যাচাই করার কথাও বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অন্বেষণ ও জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এই যাচাই পদ্ধতি ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে একটি অন্যতম শর্ত।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে শিক্ষা হল একজন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানবীয় আচরণের নিখুঁত বহিঃপ্রকাশ। তিনি আরও বলেছিলেন যে তেমনি ধর্মও হল একজন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। এই ধর্মকে শিক্ষার একটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবেও স্বীকার করেন বিবেকানন্দ। ফুটবল নাকি গীতা পাঠ - এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে শিশুদের ফুটবল খেলার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন যে গীতা পাঠ এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তো বাকি সারাটা জীবন পড়ে রয়েছে। আসলে বিবেকানন্দ প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মূল্যবোধকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুসারে, চিন্তা যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির...

রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছিলেন, হে পিতা, সেই স্বাধীনতার স্বর্গে আমার দেশকে জাগ্রত কর। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যেখানে শান্তি বিরাজমান এবং সেই শান্তিময় স্থানে শিক্ষার জীবন্ত বা প্রাণবন্ত চেহারা প্রকাশিত হবে, যা কিনা শান্তিনিকেতন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে নিয়ে এসেছেন প্রাচ্যে এবং প্রাচ্যকে নিয়ে গিয়েছেন পাশ্চাত্যে, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক অনন্যসাধারণ মেলবন্ধন, যার শিকড় ভারতীয় মাটিতে কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে তা আন্তর্জাতিক।

গান্ধীজীর শিক্ষা নিয়ে ভাবনার পরিসরও অনেক বেশী বিস্তৃত। গান্ধীজী যেমন মুক্ত শিক্ষার ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তেমনি বৃত্তি মূলক শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন, কন্যা সন্তানের ক্ষমতায় ন প্রভৃতি বিষয়ও গান্ধীজীর ভাবনায় অনেক বেশী স্থান দখল করে রয়েছে। গান্ধীজী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে দোষত্রুটি করলে শিশুদের কি ধরনের শাস্তি দেওয়া উচিত, তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে শিশুদের শাস্তি দেওয়া বা শাস্তি না দেওয়ার বিষয়টি প্রধান নয়, প্রকৃতপক্ষে শিশুদের দোষত্রুটি মুক্ত করা বা সংশোধন করাই হল মূল উদ্দেশ্য এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশুদের সংশোধন করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। পরোক্ষে এটা আসলে শিক্ষকেরই শাস্তি এবং এটাই হওয়া উচিত।

গান্ধীজীঃ থিঙ্কিং হ্যান্ড তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষের নিজের হাতই সারা জীবন ধরে একজন মানুষের সমস্ত মানবিক ভূমিকা বা কর্মপ্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। মানুষ ও সমাজের বিবর্তন এবং সর্বোপরি প্রাথমিক হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের সামগ্রিক শিক্ষাকে পরিচালিত করছে এই থিঙ্কিং হ্যান্ড। গান্ধীজী এই শিক্ষাকে “একের মধ্যে অনেক” হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বিদ্যালয়গুলিতে চরকায় সুতো কাটা কে আবশ্যিক করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি পুঁথিগত শিক্ষারও বিরোধীতা করেছিলেন। গান্ধীজী প্রাথমিক শিক্ষাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হবে এবং নিজেরাই তা সমাধান করতে শিখবে। আর সমাধান করার এই শিক্ষা হবে সম্পূর্ণভাবে অহিংস এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আর এইভাবে যদি শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পায়, তাহলে সত্যি সত্যিই যখন সে নিজের জীবনে প্রবেশ করবে, তখন সে নিজে একদম প্রস্তুত হয়েই জীবনের মুখোমুখি হতে পারবে।

শিশুরা কি ধরনের বই পড়াশোনা করবে তা নিয়েও গান্ধীজী বলেছিলেন যে শিশুরা সেই ধরনের বই পড়বে যেটা আসলে শিক্ষকদেরই পড়া উচিত। তিনি আরও বলেছিলেন যে শিশুরা অবশ্যই খেলাধুলা করবে এবং তাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিতে হবে তা অবশ্যই হবে মৌখিক। পাঠক্রমের মধ্যে কৃষিকে সংযুক্ত করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। গান্ধীজী গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পক্ষেও মত দিয়েছিলেন এবং সেখানে “তালি তালিম” (নতুন শিক্ষা) এর জন্য উপযুক্ত নথিপত্রও তিনি তৈরি করেছিলেন। তালি তালিম এর বাংলা অর্থ নতুন শিক্ষা এবং গান্ধীজী এটিকেই প্রাথমিক শিক্ষা আখ্যা দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর প্রাথমিক শিক্ষার এই পরিকল্পনা মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং রাজস্থানে সাফল্যমণ্ডিত হলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে

রামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং Eternal Values for a Changing Society গ্রন্থের লেখক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেছিলেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা এবং তার যে লক্ষ্য, ধর্মের বিজ্ঞানগত ঐতিহ্যের লক্ষ্যের মধ্যে তার প্রতিধ্বনিই হল ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি শক্তিশালী দিক। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে ধর্ম (Religion) হল গৌড়ামি থেকে মুক্ত এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর এক অনবদ্য মিশ্রণও। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের যে মিশ্রণ এবং তার যে ঘন সন্নিবদ্ধ রূপ তা বেদান্তের দর্শনকেই নির্দেশ করে। আর বিশেষভাবে বলা যায় যে এই দর্শনেরই সুগঠিত রূপ হল গীতা। বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তাধারা, কর্ম ও দর্শনে এই ব্যবহারিক বেদান্তের দর্শনকেই আধুনিক ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন, তাহলে ভুলটা কোথায়? কেমনভাবে ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তারা নিজেরাই ইতিহাসের কীট হিসেবে পরিণত হলেন? এখন শিক্ষার মানে হল কাগজের পাতায় একটা ডিগ্রী, শিক্ষাদান মানে হল শিক্ষকের দেওয়া নোট অর্থাৎ এখন একটা যান্ত্রিক নিয়মের শিকার এই শিক্ষা পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা তো শ্রেণীকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার নয়।

বর্তমানে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিও ভীষণভাবে অবহেলিত। পেশা গ্রহণের পূর্বে আধুনিক প্রযুক্তিকেও মেনে নেওয়া যায়না, বিশেষত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে

পাঠক্রমের মধ্যে কৃষিকে সংযুক্ত করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। গান্ধীজী গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পক্ষেও মত দিয়েছিলেন এবং সেখানে “তালি তালিম” (নতুন শিক্ষা) এর জন্য উপযুক্ত নথিপত্রও তিনি তৈরি করেছিলেন।

এই আধুনিক প্রযুক্তিকে সমর্থন করা যায়না। যদিও শিক্ষাকে বাণিজ্যীকরণের বিরুদ্ধে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেডিক্যাল, টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ক্যাপিটেশন ফী চালু রয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কী, এই ক্যাপিটেশন ফী এর প্রচলন আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা। আবার এটাও সত্য যে আমাদের সংবিধানের অষ্টম শিডিউলে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির শিক্ষাদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলির বেশ রমরমা ব্যবসা এবং তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অথচ এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে আমাদের দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ২% মানুষ এই ইংরাজি ভাষায় কথা বলতে পারে ও বুঝতে পারে।

আমরা এই সত্যেরও মুখোমুখি যে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতের জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে সেভাবে অংশগ্রহণ করেনি। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু কমিটি ও কমিশনও রয়েছে, তবু শিক্ষাকে শ্রেণী কক্ষের ক্ষুদ্র সীমার বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি কেন, তার উত্তর দিতে আমরা আজও অপারগ। তাই প্রশ্ন থেকেই যায়, তাহলে ভুলটা কোথায়?

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন যে অমূল্য রতন পেতে

গেলে গভীরে ডুব দিতে হবে, শুধু বাতাসে ভেসে বেড়ালে চলবে না। এই বাতাসে ভেসে বেড়ানোর সঙ্গে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে তুলনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে অমূল্য রতন পেতে গেলে শিক্ষা সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে হবে।

শিক্ষাদান করা মানে শুধু জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা নয়, শিক্ষাদান হল আসলে মনের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা এবং ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলা। আমাদের শিক্ষাদর্শন হবে এমন একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে মানবতার সৃষ্টি ঘটবে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের সংবিধানগত অঙ্গীকার ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে যেমন কোন রোগ বা ক্ষুধা থাকবে না, তেমনি কোন বঞ্চনা বা যুদ্ধের হিংস্রতাও থাকবে না, থাকবে না কোন অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার। এক কথায়, এমন একটা শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে আমাদের গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং চিরন্তন সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ভারতীয় শিক্ষা দর্শন সব সময়ই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বা অবস্থানের পক্ষে এবং তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। গান্ধীজী বলেছিলেন যে দরজা জানালা বন্ধ করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়ি কামনা করেননা। তিনি কামনা করেন এমন একটা উন্মুক্ত পরিবেশ যেখানে সমস্ত দেশের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত প্রবাহ প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু তা যেন তাঁর পা কে মাটি থেকে উড়িয়ে নিয়ে না যায়। দাবা খেলার সঙ্গে তিনি তুলনা করে বলেছিলেন যে দাবা এমন

একটি খেলা যেখানে রেফারীর প্রয়োজন হয় না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন সেই রকম রেফারীহীন খেলা না হয়ে দাঁড়ায়। বরং শিক্ষা এমনই একটা ক্ষেত্র যেখানে বাঁশি (Whistle) বাজিয়ে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

De-schooling Society এবং Re-tooling Society নামে দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থের লেখক ও খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ইভান ইলিচ আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনরায় সজ্জিত (re-orient) করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের প্রথাগত বিদ্যালয়গুলিকে (formal school) প্রথামুক্ত বিদ্যালয়ে (non formal school) উন্নীত করার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে প্রথামুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা আসলে আমাদের সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত মানুষদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাসের পাতা খুলে দেখা গেছে যে এমন এমন মুহূর্ত তৈরি হয়েছে যখন পুরনো পদ্ধতিকে পালটে নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আজকের দিনটাও তেমনই একটা মুহূর্ত যখন গোটা দেশ আরও ভাল কিছু পরিবর্তনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। ইতিপূর্বে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি, সে সুযোগ আমরা আমাদের অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এখন আরও যেসব সুযোগ আসছে, তা আর হারাতে চাই না।



সময়ের অগ্রগতির সাথে শিক্ষার অগ্রগতি

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে দেশ তথা আমাদের রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাও পাল্টেছে, পাল্টেছে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, পাল্টেছে শ্রেণীকক্ষের ধারণা এবং সেই সঙ্গে পাল্টেছে শিক্ষকদের ভূমিকাও। শিক্ষকরা আজ শুধু জ্ঞান বা তথ্য বিতরণের উৎস হিসাবে গণ্য না হয়ে শিশুদের সক্রিয়তার গুরুত্বের পথপ্রদর্শক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন।

শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন চালু হয়েছে, সেই আইনে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর বিদ্যালয়-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং বিনা ব্যয়ে উন্নতমানের করে তোলার কথা বলা আছে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের ধরে রাখার জন্য আনন্দমূলক ও খেলাচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। অভুক্ত শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়গুলিতে মিড ডে মিল- এর ব্যবস্থাও রয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পাশাপাশি শিশুরা যাতে দায়িত্ববান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়সত্তরে স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। ভবিষ্যত জীবনে শিশুরা যাতে দক্ষ প্রশাসক হয়ে উঠতে

পারে সেই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলিতে শিশু সংসদ তৈরীর কথাও বলা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কাজের জন্য শ্রেণীও বরাদ্দ রয়েছে - কিন্তু উক্ত বিষয়গুলির সবকিছুই রয়েছে কাগজে কলমে। বাস্তবে আমরা বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের সার্বজনীন পূর্ণতায় নিয়ে আসতে পারছি না, কারণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। তবু স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিয়ত নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও যেভাবে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুদের তৈরীর কাজে সচেষ্ট তা প্রশংসনীয়।

পরিশেষে আমি বলব যে বিদ্যালয়গুলিতে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কাজের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ আজকের শিশুরাই আগামী দিনের সমাজের ধারক ও বাহক। শিশু অবস্থাতেই সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কাজের আগ্রহ জন্মাতে পারলে আস্তে আস্তে এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যত জীবিকা নির্বাহের পথ গ্রহণ করতে পারবে।

তপন বর্মন (শিক্ষক)

ব্রহ্মাণীর টোকী ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়



লীলা মজুমদারের লেখনী আমাদের আজও মুগ্ধ করে। সর্বোপরি তিনি সবসময়ের সব বয়সের। নিজে সারা জীবন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যুক্ত থাকলেও তিনি ভোলেন নি ‘বিদ্যালয়’ ব্যবস্থার ধূসর চিহ্নগুলি, যেখানে প্রতিনিয়ত জমাত বাঁধে শিশু – কিশোরদের হতাশার জীবনবেদ। ‘গণশার চিঠি’ এমন একটি গল্প যেখানে বিবৃত হয়েছে এক কিশোরের আপাত হাস্যরসে উপস্থাপিত বেদনারই কাহিনী।

গণশার চিঠি লীলা মজুমদার

ভাই সন্দেশ,

অনেক দিন পর তোমাকে চিঠি লিখছি। এর মধ্যে কত কি যে ঘটে গেল যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয় যেত, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে কড়া পড়ে যেত!

আজকাল আমি আমারবাড়ি থাকি। আমার মনে হয় ওরা কেউ ভালো লোক নন। ওঁদের মধ্যে আবার মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখিনি, কিন্তু মনদা বলেছে ওঁর ইস্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর বছরের শেষের দিকে গুটিকতক টিমটিম করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়ের ছাগলের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু সুবিধের কথা নয়। ছেলেগুলো যায় কোথায়?

মাস্টারমশাইয়ের চেহারাটাও ভাই কেমন যেন! সরু-ঠ্যাং পেটেলুন উনি কখনো ধোপা বাড়ি দেন না। শাদা কালো চৌকোকাটা কোট পরছেন তো পরছেনই! আবার চুলগুলো সামনের দিকে খুদে খুদে, পেছন দিকে লম্বা মতন, মধ্যখানে দাঁড় করানো! মাঝের গোঁফ বেঁটে খাটো পাশের গোঁফ ঝুলোঝুলো! ওঁর জুতোগুলো কে জানে বাবা কিসের চামড়া, কিসের তেলে ডুবিয়ে, কিসের লোম দিয়ে সেলাই করা!

ও বাবাগো, মাগো! ইচ্ছে করে ওঁর ইস্কুলে কে যাবে! মানকে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভেতর সাতটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই পা নাচাচ্ছেন! পরের সপ্তাহে মানকে আবার দেখেছে ঘরের ভেতর ছটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের করছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখবে, ঘরের ভেতর পাঁচটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে চারটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই সেফটিপিন দিয়ে কান চুকোচ্ছেন! শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালার মারা থাকবে, আর ঘরের বাইরে নটা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে! মাস্টারমশাই খাঁড়ায় শান দেবেন!

তা ছাড়া সেই যে বিভূ আরশোলা পুষতো, একবার গুণ্ডে খেয়েছিল, সে বলেছে সে দেখেছে – মাস্টারমশাইয়ের ট্রাঙ্কে হলদে মতন তুলোট কাগজে লাল দিয়ে লেখা খাতা আছে, সে লাল কালিও হতে পারে, অন্য কালিও হতে পারে!

ওঁর লেবু গাছে মাকড়সারা কেন জানি জাল বোনে না; পেঁপে গাছে সেই গোলচোখ চকচকে জঙ্ঘ নেই, দেয়ালে টিকটিকি নেই। একটা হতে পারে, মাস্টারমশাইয়ের রোগা গিন্নি মোটা বাঁশের ডগায় বাঁটা বেঁধে দিনরাত ওত পেতে থাকেন। কিন্তু কিছু বলা যায় না! মনদা তো ওবাড়ি কোনোমতেই যায় না, মেজো ওবাড়ির ছায়াটি মাড়ায় না, আর ছোট ছেলে ধনা তারতো ওবাড়ির হাওয়া লাগলেই সর্দিকশি হয়ে যায়। রামশরণ পর্যন্ত ওবাড়ির কুল খায় না, গুড়িয়ার মা সজনের ডাঁটা নেয় না!

মা কিন্তু ওদের কুমড়ো ডাঁটা দিব্যি খান, আর বড় মামা তো ওঁরই দাদা, ওই একই ধাত! ওঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারেন, কিন্তু ভূত কি ম্যাজিক, কি মন্তুর পড়া এসব একেবারে বিশ্বাস করেন না! কে জানে কোন দিন হয়তো কানে ধরে ওই ইস্কুলেই আমাকে ভর্তি করে দেবেন, আর শেষটা কি সারা জীবন ব্যা – ব্যা করে নটে চিবুবো? ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি দেখে বড় মামা হয়তো চটি পায়েই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখবেন, পাথরের উপর শিং ঘষে শান দিচ্ছি! – কেঁউ কেঁউ, ফোঁৎ ফোঁৎ! কান্না পেয়ে গেল ভাই।

অ্যান্ডিনে তোমায় লিখছি ভাই, আর হয়তো লেখা হবে না। দিব্যি টের পাচ্ছি দিন ঘনিয়ে আসছে। বড়মামা যখন তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে বিশ্রী ফ্যাচার ফ্যাচার হাসেন। বুঝছি গতিক ভালো নয়। দু একবার তিন তলার ছাদে গিয়ে ব্যা-ব্যা-করে ডেকে দেখছি, সে আমার ঠিক হয় না। কেউ যখন দেখছে না খানকতক দুকো চিবিয়ে দেখেছি-বদ খেতে, তাতে আবার ছোটুঁয়ো পোকা ছিল! খোকনকে বলেছি গলায় দড়ি বেঁধে টেনে বেড়াতে, ও কিন্তু রাজি হল না। এদিকে অভ্যেস না থাকলে কী যে হবে তাও তো জানি!

এই সব নানা কারণে এতকাল চিঠি লিখতে পারিনি, বুঝতেই তো পারছ।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আর তর সইল না। ‘কেডস’ পায়ে দিয়ে সুটসুট করে মাস্টারমশাইয়ের বেড়া টপকে, ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে,

জানলার গরাদ খিমচে ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে চিংড়িমাছের মতন ডান্ডার আগায় চোখ বাগিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারলুম।

দেখলুম মাস্টারমশাই গলাবন্ধ কোট খুলে রেখে মোড়ায় বসে হুকো খেতে চেষ্টা করেছেন, আর গিল্মি মাটিতে বসে কুলো থেকে খাবলা খাবলা শুকনো বড়ি তুলছেন,—কোনোটা আস্ত উঠছে, গিল্মি হাসছেন; কোনোটা আধ-খ্যাঁচড়া উঠছে, গিল্মি দাঁত কিড়মিড় করছেন। আর মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙেছেন বলে সমস্তক্ষণ বকবক করছেন ভাই, বড় ভালো লাগলো।

কিন্তু আনন্দের চোটে যেই খচমচ করে উঠেছি, মাস্টারমশাই চমকে বললেন ‘ওটা কি রে?’ ভাবলুম এবার তো গেছি! কান ধরে বুলিয়ে ঘরে টেনে আনলেন, নখ দিয়ে খিমচে দিয়ে গিরগিটি মতন মুখ করে বললেন – ‘ও বাঁদর!’ বললুম, ‘আজ্ঞে সার, ছাগল বানাবেন না সার!’ বললেন, ‘বাঁদর আবার কবে ছাগল হয় রে?’ গিল্মিও ফিসফিস করে যেন বললেন, ‘ওটিকে রাখো, আমি পুষব’।

ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললুম। গিল্মি মাথায় শিং আছে কি না দেখে বললেন, ‘তোমার মতন আমার একজন খোকা ছিল’। জিজ্ঞেস করলুম, ‘তার কি হল?’ বললেন, ‘তার এখন দাড়ি গজিয়েছে।’ বলে বড় বড় বাতাসা খেতে দিলেন। তারপর বাড়ি চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না, দাড়ির সঙ্গে খুরও গছিয়েছিল কি না।

ইস্কুলের কথা এখনও কিছু ঠিক হয়নি, এই ফাঁকে তোমায় লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিও না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে-টোঁয়াড়ে খোঁজ কোর।

ইতি –

তোমাদের গণশা

আমার গ্রাম ও গ্রামের ইতিহাস



কোচবিহার জেলার অন্তর্গত আমার গ্রামের নাম ব্রহ্মাণীর চৌকী। আমার গ্রামে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস এবং তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমার গ্রামের চারপাশের অন্যান্য গ্রামগুলি হল উত্তরে আধরারো নালা, দক্ষিণে বালাডাঙ্গা, পশ্চিমে শাকদল ও পূর্বে সিঙ্গিজানি। আমরা গ্রামবাসীরা আমাদের এই গ্রামকে খুব ভালোবাসি।

আজকের বর্তমান গ্রামের সাথে এর ইতিহাসের কোনো মিল নেই। অতীতে এই গ্রামে প্রায় আধা জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং তার সাথে বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। গ্রামের সব জমি মাত্র কয়েকজন লোকের কাছে ছিল, আর বাকী লোকেরা এদের কাছে ভাগচাষী হিসাবে চাষ করত। আর এর ফলে কৃষিব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি। এক সময় খরার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদন না হওয়ায় দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে, যে সেই সময় গ্রামের অধিবাসীরা “আলের কচু” পর্যন্ত পায় নি। এই গ্রামে অবস্থিত নদীটির দ্বারা এই গ্রামে কয়েকবার বন্যাও হয়েছিল। সেই সময় রাস্তাঘাট ছিল দুর্ভেদ্য অরণ্যের মত, রাস্তার দু-পাশে ছিল ঘন বন। শোনা যায় কয়েকবার বাঘও দেখা গিয়েছিল এই বনে। তাই তখনকার দিনে হাট বাজারের প্রচলন ছিল দিনের বেলাতে। বিদ্যুতেরও প্রচলন ছিল না। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল কিন্তু তার চাহিদা

ছিল না। ফলে সে সময় গ্রামে শিক্ষার তেমন বিকাশ হয়নি। তবে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমাদের গ্রাম কৃষিকাজে আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে অনেক এগিয়ে। আজ এখানে যেমন শীতকালীন সব ধরণের সজী পাওয়া যায় তেমনি অন্যান্য সময় ধান সহ নানা ফসলের চাষ হয়। এখন বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত, গ্রামের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যুৎ আছে। বর্তমানে সোলার লাইট আমার গ্রামটিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। পানীয় জলের ব্যবস্থাও খুব উন্নত, গ্রামের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে টাইম কলের ব্যবস্থা আছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব সহায়ক। আমাদের গ্রামে এখন ৩ টি প্রাইমারী স্কুল আছে এবং ১ টি হাইস্কুল আছে। হাইস্কুলে আশে পাশের গ্রাম থেকেও ছাত্ররা আসছে এবং এখানে এখন শিক্ষার চাহিদাও যথেষ্ট। এখানে যে নদীটি আছে সেখান থেকে গ্রামের লোকেরা অবাধে মাছ সংগ্রহ করে। এখন আমরা এই গ্রামে ৯৭ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং বাকীরা চাকুরীজীবী আর কিছু লোক মৎস্যচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বর্তমানে কৃষি ও শিক্ষাব্যবস্থার যে ভাবে উন্নতি ঘটছে তাতে আমি মনে করি যে আমার গ্রামটি কোচবিহার জেলায় একদিন প্রথম স্থান অধিকার করবে।

মামিনুর মিয়া (ছাত্র), নবম শ্রেণী

ব্রহ্মাণীর চৌকী হাইস্কুল

সেই সময়

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান স্কটিশ ইতিহাসবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডব্লিউ. হান্টার বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের যে অনুপঞ্জ ইতিহাস লিখেছিলেন তার মধ্য থেকে একটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস-অংশটি বেছে নিয়ে তার প্রধান দিকগুলি তুলে ধরা হলো। আমরা আশা করব গ্রামীণ-বাংলার শিক্ষাসনে যে সমস্ত শিক্ষকরা ইতিহাস পড়াচ্ছেন তাঁরা এই রচনাংশ থেকে সমৃদ্ধ হবেন এবং এর তথ্য ও বিশ্লেষণ পড়ুয়াদের নিজেদের মতো করে তুলে ধরবেন।

কুচবিহার

দ্য স্টেট অফ কুচবিহার। হ্যাঁ এই নামেই পরিচিত ছিল কুচবিহার। পরবর্তীকালে সেটাই হয়ে যায় কোচবিহার। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসেব অনুযায়ী কুচবিহারের আয়তন ১২৯১.৮৩ বর্গমাইল কিন্তু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী কুচবিহারের আয়তন দেখানো হয়েছে ১৩০৬ বর্গমাইল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের



এই সেনসাস অনুযায়ী কুচবিহারের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৩২,৫৬৫ জন। গ্রামের সংখ্যা ছিল মোট ১১৯৯ টি। বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮১,৮২০ টি। প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৪০৭ জন। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৫২.৩ পুরুষ এবং শতকরা ৩৩.৩ ছিল শিশুর অনুপাত আর মোট আয়তনের ১০০৯.২৯ বর্গ মাইল ছিল কৃষি এলাকা এবং নদী পুকুর ইত্যাদি বাদে ১৯৫.৪৮ বর্গ মাইল ছিল জঙ্গল এলাকা। সমগ্র কুচবিহার জেলাটিকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভাগ করা হয়েছিল তিনটি সাবডিভিশনে। সেই তিনটি সাবডিভিশন হল - মেখলিগঞ্জ, দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গা।

কুচবিহারের রাজারা বংশানুক্রমিক ভাবে এই কুচবিহার শাসন করতেন। দ্য স্টেট অফ কুচবিহারের শাসনের ভার রাজাদের হাতে থাকলেও তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে তা ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে মাত্র ৬৭,৭০০.১৫ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কুচবিহারের রাজারা এই শাসনের দায়িত্ব অর্জন করেছিলেন। সেটা ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু কুচবিহারের রাজাদের হাতে শাসনের ক্ষমতা থাকলেও তার পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ অফিসাররা। এই ব্রিটিশ অফিসাররা কুচবিহারে কমিশনার পদমর্যাদার অধিকারী হতেন।

কুচবিহার ছিল কৃষি সমৃদ্ধ উর্বর সমতল ভূমি। একমাত্র উত্তর পূর্ব অংশে ছিল ঘন জঙ্গল। কৃষির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জলের কোনও অসুবিধা ছিলনা সেখানে। বছরের সমস্ত ঋতুতেই চাষের জন্য জল পাওয়া যেত। যদিও চাষের কাজে নদীর জল নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করা হতো না কিন্তু নদী গুলিতে জল থাকত সারা বছর অর্থাৎ নদীর

জলের উপর চাষের কাজ নির্ভরশীল ছিল না। তবে নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকার ফলে সবসময় নৌকা চলাচল করতো। মূলত ব্যবসার কারণে মালপত্র বহনের জন্য নদীপথে নৌকার

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এই সেনসাস অনুযায়ী কুচবিহারের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৩২,৫৬৫ জন। গ্রামের সংখ্যা ছিল মোট ১১৯৯ টি। বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮১,৮২০ টি।

চল ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কুচবিহারে মূল নদীর সংখ্যা ছিল ছয়টি। নদীগুলি হল - তিস্তা, তোর্সা, সিংগিমারি, কালজানি, রায়ডাক এবং গদাধর। কুচবিহারে তোর্সা নদীটি ধরলা বা ধল্লা নামেও পরিচিত ছিল। এসময় কুচবিহারে কিছু কিছু জলাশয়ের কথা জানা যায়। কখনও কখনও নদীগুলির

গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পুরনো গতিপথগুলিতে প্রাকৃতিক ভাবেই কিছু কিছু বন্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কুচবিহারের অধিকাংশ মানুষ জীবিকার জন্য মূলত কৃষির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। কিছু মানুষ অবশ্য নৌকা চালনা, মাছ ধরা ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ছিল কিন্তু তা ছিল মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা দুই ভাগ মানুষ।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে মাত্র ৬৭,৭০০.১৫ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কুচবিহারের রাজারা এই শাসনের দায়িত্ব অর্জন করেছিলেন। সেটা ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রামের সংখ্যা দেওয়া হলেও ক্যাপ্টেন লিউইনের মত উদ্ধৃত করে হান্টার জানান যে দ্য স্টেট অফ কুচবিহারে প্রকৃতপক্ষে গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। আসলে এগুলি ছিল এক একটা ফার্ম বা কৃষিখামার এবং সেই সব কৃষিখামারকে কেন্দ্র করে চাষিরা তাদের আত্মীয়-পরিজন সহ বাস করত। তাদের

বাড়িগুলি ছিল বাঁশ এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন সব গাছ দিয়ে ঘেরা। ইটের তৈরি বাড়ি ছিল একমাত্র কুচবিহার শহরে। এর মধ্যে কুচবিহারের রাজাদের প্যালেস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্যালেসটি তৈরি হয় কুচবিহারের ১৭ তম রাজা হরেন্দ্র নারায়নের আমলে। কুচবিহার শহরে এসময় কিছু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর কথা জানা যায়, তাদের বাড়িগুলিও ছিল ইটের তৈরি। কিন্তু আকারের দিক থেকে সেই বাড়িগুলি ছিল খুব ছোট। এই মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা মূলত রপ্তানী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুচবিহারে আরও কয়েকটি বিল্ডিং ছিল, সেগুলি হল চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, পাবলিক লাইব্রেরী এবং ছাপাখানা।

কুচবিহার শহরের সম্পন্ন বাসিন্দারা সে সময় মূলত যেসব পোশাক ব্যবহার করত সেগুলি হল ধুতি, শার্ট, চাদর ইত্যাদি। গ্রামের সম্পন্ন চাষিরা ব্যবহার করত খাটো ধুতি এবং বিশেষ কোনও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও শীতকালে ব্যবহার করত সুতির চাদর। আর তাদের শোয়ার জন্য ব্যবস্থা ছিল বাঁশের তৈরি মাচান। অর্থাৎ মাচানের উপর শুয়ে তারা রাত কাটাত। তাদের বাড়িগুলি ছিল কুঁড়ে ঘরের মত। তাদের বাড়িগুলি ছিল বাঁশ ও ঘাসের খড় দিয়ে তৈরি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে সে সময় ১০০ টি বাঁশের দাম ছিল মাত্র তিন টাকা। গ্রামগুলিতে যারা সম্পন্ন পরিবার, তাদের বাড়িতে পাঁচ জন বয়স্ক মানুষ এবং তাদের চারজন ছেলেমেয়ে সহ জীবনধারণের জন্য মাসিক খরচ ছিল ২০ টাকা এবং যারা এর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছিল তাদের জীবনধারণের জন্য মাসিক খরচ হত ১২ টাকা থেকে ১৪ টাকা।

কুচবিহারে মূলত ধানের চাষ ই হতো। সাধারণত দুই প্রকার ধানের কথা জানা যায় সেই দুই প্রকার ধান হল -আউস ধান এবং আমন ধান বা হৈমন্তীকা। এর মধ্যে আউস ধান হত সাতাশ প্রকারের এবং আমন ধান ছিল ছিয়াত্তর প্রকার। ধান থেকে চিড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদি তৈরি করার রেওয়াজ ছিল সেই সময়। সেই সময় প্রতি সের চিড়ার দাম ছিল দেড় আনা অর্থাৎ দেড় আনা দামে পাওয়া যেত এক সের চিড়া। মুড়ি বা খইয়ের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে তৈরি হতো মোয়া। এই মোয়া বিক্রি হতো প্রতি সের আড়াই আনা দামে। সে সময় চাল সেদ্ধ করে তাকে দু তিন দিন ধরে পচিয়ে এক ধরণের মদ তৈরি করা হতো, যাকে বলা হতো শরাব। এই শরাবের বিক্রয়মূল্য ছিল আট আনা থেকে এক টাকা চল্লিশ পয়সা প্রতি সের। প্রয়োজনে কৃষকরা গৃহপালিত পশুও বিক্রি করত। সে সময় একটি সাধারণ গরুর দাম ছিল দশ

টাকা থেকে কুড়ি টাকা এবং এক জোড়া মহিষের বিক্রয়মূল্য ছিল পঞ্চাশ টাকা।

সে সময় কৃষি কাজের জন্য দিনমজুরও পাওয়া যেত। স্থানীয় এলাকায় যারা ক্ষুদ্র চাষি - তাদের নিজেদের জমিতে যখন কোনও কাজ থাকত না, তখন তারাও দিনমজুর হিসেবে কাজ করত। তবে বেশীর ভাগ দিনমজুর আসত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বাংলার বাইরে থেকেও দিনমজুররা কুচবিহারে আসত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুরের মাসিক পারিশ্রমিক ছিল ২ টাকা, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয় তিন টাকা এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ৫ টাকা। কৃষি কাজ ছাড়াও রাস্তা তৈরি, মালপত্র বহন করা ইত্যাদি পারিশ্রম মূলক কাজে যারা দিনমজুরের কাজ করত তাদের পারিশ্রমিক ছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ১.৮ টাকা, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিন টাকা এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় মাসিক সাত টাকা।

কুচবিহারে এ সময় দু জন মুসলিম ভূস্বামীর কথা জানা যায়, যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে জমির ইজারাদারি নিয়েছিলেন। এদের ইজারাদার বলা হতো। এই ইজারাদারদের অধীনে প্রচুর পরিমাণে মুসলিম জোতদার ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সে সময় কুচবিহারে কোনও ইউরোপিয়ান ভূস্বামীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কুচবিহারে অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবি। কিন্তু কৃষি কাজ বাদেও কিছু মানুষ মোটা সিল্কের কাপড় তৈরি করার পেশায় নিযুক্ত ছিল। তারা একধরণের সিল্কের কাপড় তৈরি করত যা লম্বায় ছিল ১৮ ফিট এবং চওড়া ছিল ৪ ফিট। এই কাপড়গুলিকে কুচবিহারে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো এনডি বা এড়ি। এই কাপড় গুলির বিক্রয়মূল্য ছিল প্রতিটি ৬ টাকা থেকে ১০ টাকা। কাপড়ের গুণগত মান অনুসারে এই দাম ধার্য করা হতো। আরও একধরণের কাপড় তৈরি হতো, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো মেখলি। এই কাপড় তৈরি করার জন্য পাট ব্যবহার করা হতো।

এই কাপড়গুলি বিক্রি হত প্রতিটি ১২ আনা থেকে ১ টাকা দামে। মেখলিগঞ্জ এই কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো এবং মেখলিগঞ্জের নাম অনুসারেই কাপড়টির নাম হয় মেখলি। হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের জন্য পরবর্তীকালে কুচবিহারে একটি স্কুলও গড়ে উঠেছিল। সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একজন চাইনিজ ছুতারকে, সেই সঙ্গে কামার, কুমোর প্রভৃতি লোকজনকেও সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এটা উল্লেখ্য যে কুচবিহারে নিয়মিত ভাবে কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি

যেসব পোশাক ব্যবহার করত সেগুলি হল ধুতি, শার্ট, চাদর ইত্যাদি। গ্রামের সম্পন্ন চাষিরা ব্যবহার করত খাটো ধুতি এবং বিশেষ কোনও উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও শীতকালে ব্যবহার করত সুতির চাদর।

সাধারণত দুই প্রকার ধানের কথা জানা যায় সেই দুই প্রকার ধান হল -আউস ধান এবং আমন ধান বা হৈমন্তীকা। এর মধ্যে আউস ধান হত সাতাশ প্রকারের এবং আমন ধান ছিল ছিয়াত্তর প্রকার।

কিন্তু কৃষি কাজ বাদেও কিছু মানুষ মোটা সিল্কের কাপড় তৈরি করার পেশায় নিযুক্ত ছিল। তারা একধরণের সিল্কের কাপড় তৈরি করত যা লম্বায় ছিল ১৮ ফিট এবং চওড়া ছিল ৪ ফিট। এই কাপড়গুলিকে কুচবিহারে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো এনডি বা এড়ি।

গড়ে ওঠেনি। তবে সাধারণ মানুষেরা যারা কৃষিকাজের পাশাপাশি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করত, তারা ধীরে ধীরে হস্ত শিল্প কেই মূল পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ এটিই তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে।

কুচবিহারের বাইরে অন্যান্য জেলা থেকে আগত কিছু পেশাদার লোকজনকে এসময় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টেও নিযুক্ত করা হত। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করার জন্য একজন ছুতার এবং একজন রাজমিস্ত্রি পারিশ্রমিক পেত মাসে ৭ টাকা থেকে ২৫ টাকা। এর মধ্যে যারা সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক পেত তারা হল কুচবিহারের স্থানীয় মানুষ। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণের

জন্য একটি স্কুল ও একটি পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়া কুচবিহারে সে সময় আর কোনও ইন্সটিটিউশন, সোসাইটি বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তবে দ্য স্টেট অফ কুচবিহারের সহায়তায় বেশ কিছু বিদ্যালয় চালু ছিল। কুচবিহারে সে সময় কোনও সংবাদপত্রও ছিলনা। একটিমাত্র ছাপাখানা ছিল কিন্তু সেখানে প্রশাসনিক কাজের জন্য বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বিভিন্ন রকম সরকারী নোটিশ, ফর্ম ইত্যাদি ছাপা হতো। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে স্কুল ছিল মাত্র একটি। সেখানে পড়ুয়া ছিল মাত্র ৩৬ জন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৬, পাশাপাশি পড়ুয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এসময় পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ১৪৮৬ জন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় ২৪৫ টি। পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ৬৪৯৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫২ জন।

কুচবিহারে সে সময় ব্যবসা বাণিজ্যের যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য ছিল মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের হাতে। কুচবিহার থেকে সে সময় রপ্তানি করা হতো তামাক, পাট, সর্ষে বীজ, সর্ষের তেল, চাল ইত্যাদি। আর আমদানি করা হতো সংসারে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, চিনি, গুড়,

মশলা, শুকনো মাছ প্রভৃতি। আর এই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কুচবিহার শহর। কুচবিহারে তখন উল্লেখযোগ্য

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে স্কুল ছিল মাত্র একটি। সেখানে পড়ুয়া ছিল মাত্র ৩৬ জন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৬, পাশাপাশি পড়ুয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এসময় পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ১৪৮৬ জন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় ২৪৫ টি। পড়ুয়ার সংখ্যা হয় ৬৪৯৭ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫২ জন।

একমাত্র গ্রামীণ মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো চৈত্র মাসে কালজানি নদীর ডানদিকের পাড়ে। মেলার মূল স্থানটি ছিল কুচবিহার শহর থেকে এগারো মাইল দূরে। মেলাটি চলত তিনদিন ধরে। মেলাটি গদাধর মেলা নামে পরিচিত ছিল। এই মেলাতে মূলত স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই অংশগ্রহণ করত।

কুচবিহারের আবহাওয়া ছিল মনোরম। অন্যান্য জেলার মতো কুচবিহারে গ্রীষ্মকালে খুব গরম অনুভূত হতোনা। শীতকালে সকালে ঘন কুয়াশা দেখা যেত। সারা বছর ধরেই বইত ঝির ঝিরে বাতাস। বৃষ্টি হতো এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস

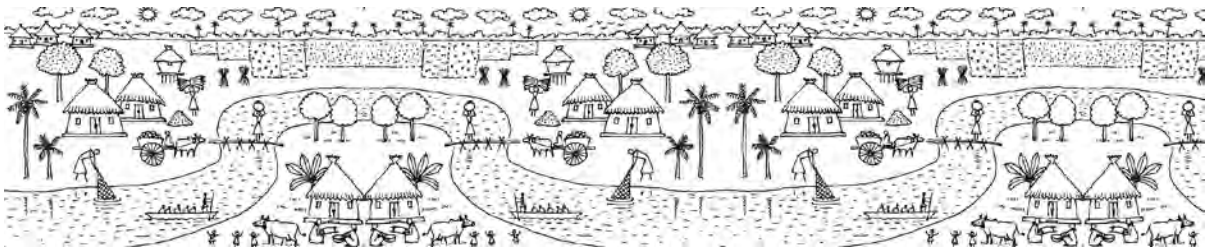
অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১৫৭.২২ ইঞ্চি এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮৯.৮০ ইঞ্চি।

পরিশেষে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ। কিন্তু মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি অকালে পর লোকগমন করেন। আর তখন

কুচবিহারে তখন উল্লেখযোগ্য একমাত্র গ্রামীণ মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো চৈত্র মাসে কালজানি নদীর ডানদিকের পাড়ে। মেলার মূল স্থানটি ছিল কুচবিহার শহর থেকে এগারো মাইল দূরে। মেলাটি চলত তিনদিন ধরে। মেলাটি গদাধর মেলা নামে পরিচিত ছিল। এই মেলাতে মূলত স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই অংশগ্রহণ করত।

তাঁর একমাত্র পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের বয়স মাত্র দশ মাস। রাজপদে বসার জন্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নৃপেন্দ্রনারায়ণকে অস্বীকার না করলেও ব্রিটিশরা এই সুযোগে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার স্টেটের প্রশাসনিক দায়িত্ব পরোক্ষ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাগটনকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে কুচবিহার স্টেটের কমিশনার নিযুক্ত করা হয়।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে হান্টার যখন কুচবিহার স্টেটের এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন, ঠিক সেই সময় একজন ইংরেজ গৃহ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাটনা কলেজের ছাত্র হিসেবে অধ্যয়নরত। সময়টা হল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ।



নতুন পথের যাত্রী আরতি ...

কুচবিহার জেলার দিনহাটা ১ নং ব্লকে অবস্থিত ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত। শাকদল এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ মহিলারাই অবসর সময়ে যুক্ত থাকে বিড়ি বাঁধার কাজে যাতে একটু অতিরিক্ত আয় করে পরিবারকে সাহায্য করা যায়। আরতীও ছিল না তার ব্যতিক্রম - স্বামী সুকুমার বর্মণ একটি দোকানে কাজ করে আর ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ আরতী বিড়ী বাধে, এইভাবে কোনোমতে চলে তাদের দিন। এমন সময় আরতী খবর পেল যে পাড়াতে গ্রাম পঞ্চায়েত একটা মিটিং ডেকেছে। নির্দিষ্ট দিনে অনেকের সাথে আরতীও

গেল সেই মিটিং-এ। সেখানে সে জানতে পারল গ্রাম পঞ্চায়েত কি কি কাজ করছে গ্রামের জন্য, সেখানে সে আরও জানতে পারল যে গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের মত যারা স্কুল শেষ করতে পারে নি তাদের নিয়েও কিছু করতে চায়। বুকভরা একরাশ আশা নিয়ে সে ফিরে আসে বাড়িতে। কিছুদিন পরে আবার মিটিং হল তাদের নিয়ে সেখানে আরতি জানতে পারল



নানা নতুন নতুন আয়ের পথ। বাড়ি ফিরে স্বামীর সাথে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিল একটা চেষ্টা করাই যাক। সে ঠিক করল তার একমাত্র সম্বল বাড়ির সামনে পড়ে থাকা এককাঠা জমিতে ওল চাষ করবে কারণ ওল এলাকায় হয় না। পঞ্চায়েতকে দরখাস্ত করার পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম করে চাষযোগ্য করে ফেলল তার ছোট্ট জমিটাকে। নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েত থেকে যা বীজ দেওয়া হবে তা ফেরত দিতে হবে এই শর্তে সে পেল ৪০ কেজি উন্নত মানের ওল বীজ। পঞ্চায়েত থেকে লোক এসে হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়ে গেল কিভাবে বীজ কাটতে হয়, কিভাবে পুততে হয়। আর সেগুলো শিখে নিয়ে সেইমত এগুতে লাগল আরতি। প্রতিনিয়ত বন্ধুর মত পঞ্চায়েত থেকে লোক এসে শিখিয়ে দিত পরিচর্যার নানান বিষয়। বাড়তে লাগল গাছগুলি। পাড়াতে হওয়া পঞ্চায়েতের মিটিং গুলিতেও নিয়মিত যেতে লাগল সে। এমনি এক মিটিং

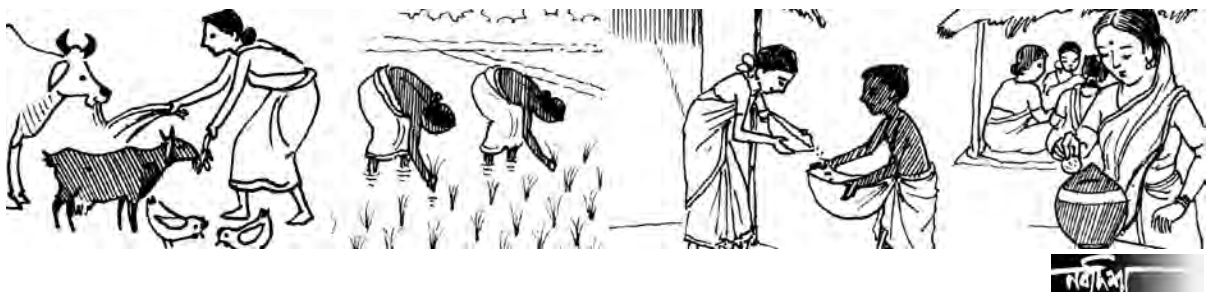
থেকে সে শুনছিল অ্যাজোলা আর ভার্মিকম্পোস্টের কথা, জেনেছিল তার গুণাগুণ। মিটিং থেকে সে আরো জেনেছিল অ্যাজোলা নাকি খুব ভালো পশুখাদ্য আর ভার্মিকম্পোস্ট নাকি দারুণ এক জৈব সার। পঞ্চায়েতের বাড়ানো হাত ধরে দ্বিগুণ উৎসাহে সে শুরু করল এই দুটি উদ্যোগও। প্রথমদিকে গরুগুলো অ্যাজোলা না খেতে চাইলেও ধীরে ধীরে খেতে অভ্যস্ত আজ আরতি বলছে “প্রথম প্রথম গরু অ্যাজোলা খেত না, এখন নিয়মিত খাচ্ছে। অ্যাজোলা খাওয়ার পর, গরুর চেহারাও ভালো হয়েছে আর সবচেয়েড়বড় কথা গরুর দুধের পরিমাণ বেড়েছে।”

ভার্মিকম্পোস্টও ব্যবহার করে জমিকেও উর্বর করে তুলছিল আরতি। কিছুদিন আগে নিজের প্রয়োজনে আরতি ২ টি ওল তুলেছিল প্রতিটির ওজন ৬-৭ কেজি। আরতীর হিসাবে বাগানে যা গাছ আছে তাতে পঞ্চায়েতকে ফেরত দিয়েও তার নিজের থাকবে প্রায় ২৪০ কেজি থেকে ২৬০ কেজি।

আরতীর কাজ দেখে পঞ্চায়েত

থেকে একদিন ব্যবস্থা করেছিল আরতীর মত আরো অনেক আরতীকে তার কাজ দেখিয়ে আনার। সেই কাজ দেখে গিয়ে এবং আরতি-র কাছ থেকে কিছুটা শিখে নিয়ে নিজে থেকেই পলিথিন কিনে জ্যোৎস্নাও অ্যাজোলা তৈরী করতে শুরু করে। আর আজকে সেই জ্যোৎস্না বলছে “বিড়ির কুলো থুয়ে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যাই - তবু ঘাস পাই না, এখন বাড়িতে অ্যাজোলা করে সবুজ ঘাসের মত গরুকে খাওয়াচ্ছি।” আরতী, জ্যোৎস্না একথাপ এগিয়ে এখন চিন্তা করছে কিভাবে সারা বছর ধরে অ্যাজোলা সংরক্ষণ করে গরুকে খাওয়াবে।

আর আরতি তো তার ওল গাছের ফাঁকে ফাঁকে সীম পুতে তারও ফলন তুলছে ঘরে। সীম বিক্রিও করছে। সে এখন বিশ্বাস করতে শিখেছে পড়াশুনা না করলেও কিছু করা যায়। তাই তার এখন একমাত্র চিন্তা আর নতুন কি শেখা যায় যা থেকে কিছু বাড়তি আয় আসে সংসারে।



বিদ্যালয়-স্তরে কৃষিশিক্ষা প্রসঙ্গে একটি বিনম্র প্রস্তাবনা

একুশ শতকের এই দ্বিতীয় দশকের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষির সম্ভাবনাগুলি নিয়ে বহুমাত্রিক আলোচনার জায়গা তৈরী হচ্ছে এবং বিভিন্ন মহলে বিদ্যালয়স্তরে কৃষি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, প্রায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে এনিয়ে আলোচনা নতুন করে শুরু করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি- যদিও গত দুবছরে বাংলার প্রাথমিক স্তরের বিদ্যাচর্চায় এমন অনেক জিনিস ঘটে চলেছে, যা হয়তো আমাদের আরো বেশী করে বিদ্যালয়ে কৃষি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ প্রসঙ্গে আরো সক্রিয় হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। সেজন্য আমরা তুলে ধরতে চাই এমন কিছু প্রস্তাব যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হবে এর অবশ্যম্ভাবী গুরুত্ব এবং তাৎপর্যগুলি।

(II) কৃষিশিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী কখনোই কৃষিকে শুধুমাত্র জীবিকা হিসেবে দেখবে না বরঞ্চ কৃষি এখানে হয়ে উঠবে প্রকৃতি এবং নিসর্গের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার রাস্তা।

(II) বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কৃষি আসতে হবে অনেক সার্বিক ভাবে, যা উন্নয়নের, বিশেষত মূলধারার উন্নয়নের সমস্যাগুলি প্রসঙ্গে তা যেমন খুব ছোট থেকেই পড়ুয়া মনে বোধ সৃষ্টি করবে, তেমনই কৃষি কিভাবে আরো সুস্থায়ীত্বের আধার হতে পারে সে প্রসঙ্গেও পড়ুয়াদের মধ্যে চেতনা বিস্তারে সহায়ক হবে।

(III) যখন পাঠ্যসূচীতে কৃষি আসবে তখন খেয়াল রাখতে হবে যেন শুধুমাত্র বিজ্ঞান বাহিত জ্ঞান হিসাব না আসে। বরঞ্চ আমাদের দেখতে হবে অনন্তকাল ধরে যে কৃষক আমাদের বীজ, মৃত্তিকা, জল ধরে রেখেছে, সে প্রসঙ্গে তার জ্ঞান এবং দক্ষতাও যেন পাঠ্য বইতে আসে, যদিও খেয়াল রাখতে হবে বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞানগুলি যেন প্রাস্তিক না হয়ে যায়।

(IV) পাঠ্যসূচীতে যখন কৃষি আসবে সেখানে যেন কৃষির সাংস্কৃতিক বাতাবরণগুলিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন যদি ধান বিষয়ে পড়ানো হয় তখন যেন ধানকে ঘিরে যে সারা বাংলায় এমনকি সারা দেশে যে উৎসবের রীতি প্রচলিত রয়েছে তা যেন আলোচিত হয়। এখানে খেয়াল রাখতে হবে এইসব উৎসবগুলি যেন বিশেষ কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর উৎসব হিসেবে প্রতিভাত না হয়।

(V) খুব ভালো ভাবে আমাদের তুলে ধরতে হবে আধুনিক সময়ের কৃষির সমস্যাগুলি। যে সমস্যাগুলি পড়ুয়াদের কাছে খুব জটিল মনে হবে না এবং তার সমাধানগুলিও ঘরোয়া ভাবে করা সম্ভব নয় এরকম ধারণাও সৃষ্টি করবে না।

(VI) কৃষির মধ্যে পশুপালন এবং মাছ চাষও যেন অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা পুরো পাঠ্যসূচীতে গুরুত্ব সহকারে অঙ্গীভূত হয় তার উপরেও দৃষ্টিপাত করতে হবে। এখানে মনে রাখা দরকার মৎস্যচাষ এবং পশুপালনের অর্থনীতিও যেন প্রাধান্য সহকারে আলোচিত হয়। কারণ যে পড়ুয়া কৃষি, মাছচাষ, পশুপালন ইত্যাদিতে উদ্যোগী হতে চায় তাদের যেন দক্ষতার জায়গাটি তৈরী হতে পারে।

(VII) সারা দেশ জুড়ে সরকারী কৃষি উদ্যোগ এবং পরিষেবাগুলি প্রসঙ্গে পড়ুয়াদের যাতে ভালো ধারণা তৈরী হয় এবং এগুলির সশক্তিকরণ প্রসঙ্গে তারা নিজস্ব গ্রামীণ পরিসরে আরো উদ্যোগী হতে শেখে তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এর পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হবে যেন পাঠ্যসূচীতে কৃষি বিষয়ক অসংখ্য সরকারী ক্ষিমগুলির সমস্যা সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা প্রসঙ্গে যেন তাদের মধ্যে নতুন চেতনা সৃষ্টি করা যায়।

(VIII) সারা পৃথিবীতে আজ বিকল্প কৃষি ভাবনা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে যে আলোচনা চলছে সেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আমাদের মধ্যে অনেক নতুন প্রত্যয় যেমন সৃষ্টি করবে তেমন যেসব পড়ুয়া নিজেরা এই ধরনের উদ্যোগ তার কর্মজীবনে নিতে চায়, তার কাছেও যেন এইসব উদাহরণগুলি একটা প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

(IX) খুব গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে হবে কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে। সারা পৃথিবীতে কৃষি-ভিত্তিক শিল্প নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে এবং এখানে বহুজাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যে বিপুল পরিমাণ লাভ করছে তার পিছনে তাদের বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত প্রক্রিয়াকরণের কৌশলগুলির ভূমিকা অসম্ভব জরুরী। কিন্তু স্বল্প অর্থ ব্যয়ে স্থানীয় বাজারের চাহিদা-পছন্দ মাথায় রেখে যাতে এই কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে পড়ুয়াদের মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করা যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(X) পুরো পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচীকে হয়ে উঠতে হবে সুস্থায়ী উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে একটি নিবিড় ধারণা পত্র, একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং অনাহার-অপুষ্টিতে ভরা দেশে কৃষির জীবিকাগত মূল্যই গুরুত্ব পাবে সবচেয়ে বেশি এনিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, তবে কৃষির সাংস্কৃতিক মূল্য যেন কোনো ভাবে অবহেলিত না হয়, সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

এবারে প্রশ্ন হলো আমরা কোন শ্রেণী থেকে এই কৃষি-পাঠ শুরু করতে চাইছি। আমাদের মনে হয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ এর প্রকৃষ্ট সময়। প্রথমে ‘প্রকৃতি-পরিবেশ’ ‘প্রকৃতি-বিজ্ঞান’ বা ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত করে এবং পরে যদি এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

পায় তবে আলাদা ভাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। আমরা মনে করি না শুধুমাত্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে আসা শিক্ষকরাই পড়াতে পারবেন। এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'শিক্ষক' হয়ে উঠবেন গ্রামের অভিজ্ঞ কৃষকমন্ডলী, মাছ চাষ এবং পশুপালনে ব্যাপ্ত গ্রামের শিক্ষকরা। এর পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যারা কৃষি পরিষেবা এবং উন্নয়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত তাঁরাও এনিয়ে তাদের মতামত রাখবেন এটাই তো স্বাভাবিক। সারা দেশে প্রচুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আমরা কি ভাবতে পারি উদ্ভিদবিদ্যার কোনো প্রফেসর ক্লাস নাইনের ছাত্র-ছাত্রীদের

বোঝাচ্ছেন তাদের মতো করে। অথবা তিনি তার জ্ঞান বিনিময় করছেন এলাকার বয়স্ক চাষীদের সাথে। ভাবা যেতেই পারে, কারণ ভাবনার বীজই একদিন মহীরুহ হয়। সেখানে আশ্রয় পায় হাজার হাজার নতুন ভাবনার পাখিরা। খুব সহজ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ভাবনাগুলি তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। এনিয়ে আলোচনা হোক ---- তবে মূলকথা হল আমরা নতুন একটা বিষয়ে 'ভার' চাপাতে চাইছি না। আমরা চাইছি উন্নত কৃষি, উন্নত-গ্রাম, উন্নত-দেশ। যে দেশে বিজ্ঞানের সম্ভ্রান্ত জ্ঞান আর মাটির গন্ধ-মাখা জ্ঞান হাত ধরাধরি করে চলে।

বাংলা প্রবাদে প্রতিবিম্বিত কৃষি-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অনন্ত গভীরতা



খনার বচনঃ

হাদিমা হান্দ চেষ্টে, কৃষান বোনে খান,
আগে খান চোর চোড়া, সিঁছে খান কৃষান।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরি খনার বচনের একটি সংকলন নবদিশার সঙ্গে যোগাযোগ করলে পেতে পারেন।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, উপস্থাপনার মেধাবী মুসীমানায়, প্রসাদগুণে এবং সর্বোপরি পাণ্ডিত্যের গভীরতায় মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা প্রবাদ এবং কৃষি বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থটি এককথায় অনবদ্য। এনিয়ে বাংলা ভাষায় যে খুব একটা চর্চা বা আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি, তা বলা বাহুল্য। সেজন্য এ ধরনের প্রায় অ-গবেষিত থেকে যাওয়া বিপুল উপাদানের মধ্য থেকে তিনি যে বিষয় প্রতিমা নির্মাণ করেছেন তা তার ক্ষমতার গভীরতার সূচক বহন করছে।

বাংলার প্রবাদ-বিশ্ব শুধু জটিল তাই-ই নয়, তার মধ্যে এমন অনেক স্থানিক অ-স্থানিক লোক উপাদান মিশে রয়েছে যে সেগুলো যদি খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে মূল রসগ্রহণে অনেক অসুবিধা হতে পারে। মনাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে রয়েছে ১৮ টি নিখুঁত ভাবে বিভাজিত অধ্যায়। একদম শুরুর অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন প্রবাদের সংজ্ঞা এবং তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রবাদের বর্গীকরণ নিয়ে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন কৃষি বিষয়ক বাংলা প্রবাদ, জলবায়ু সংক্রান্ত বাংলা প্রবাদ এবং সার সংক্রান্ত বাংলা প্রবাদ নিয়ে। শুধু তাই নয় এর পরে অধ্যায়গুলিতে তিনি তুলে এনেছেন বাংলা প্রবাদে কৃষি মাপজোক, কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল সুরক্ষা, ধান চাষ, ফল এবং বাগিচা ব্যবস্থাপনা, লোক-চিকিৎসা এবং ভেষজ উপাদান, কৃষিবন ও বনস্পতি, জৈব-বৈচিত্র্য, রেশম, মধু-মৌমাছি এবং মাছ ও পশুপালন। একদম শেষ অধ্যায়টি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে-এর বিষয় 'বাংলা প্রবাদ শস্য দেবদেবী'। আমরা ইতিপূর্বে এভাবে প্রবাদের দুনিয়া মন্তন করা বই পেয়েছি কিনা, বা না পেলে কবে পাবো এসব নিয়ে যেহেতু এখনো সুনিশ্চিত নই, তাই 'নবদিশা'র পক্ষ হতে অনুরোধ করবো যেন এই মহা গ্রন্থ আরো প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ডাবনায় শিক্ষা

মারিয়া মন্টেসরি

ছোটদের বাড়ি বা চিলড্রেনস্ হাউস। নতুন ধারার শিক্ষা আন্দোলনের তীর্থভূমি। এই বাড়ির ভিতর চলছে এক কর্মযজ্ঞ। ছোটরা শিখবে, তাই চলছে প্রস্তুতি। শেখার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে – নানান পড়া-শেখার সামগ্রী সাজানো রয়েছে, সেইসব সামগ্রী নেড়ে চেড়ে তাদের শেখা শুরু হচ্ছে। বাচ্চারা শিখছে নিজে নিজেই। মুক্ত শেখা। শিক্ষক রয়েছেন তবে তিনি সাহায্যকারীর ভূমিকায় রয়েছেন। বাচ্চারা স্বাধীন ভাবে শিখছে – একে অপরকে দেখে শিখছে। পড়ুয়ারা এখানে স্বাধীন, সক্রিয়। এই শেখার পরিবেশে পড়ুয়াদের আচার আচরণ লক্ষ্য রাখছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। খেয়াল রাখছেন শিক্ষণ সামগ্রীগুলো যেন বাচ্চাদের ব্যবহারের সুবিধাকে মাথায় রেখে সাজানো থাকে। উপকরণ হাতে নাতে ব্যবহার করে বাচ্চাদের যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেটাকেও নজর রাখছেন শিক্ষক শিক্ষিকা। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ হলো শিশুর সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শেখার পরিবেশ প্রস্তুত করা। বাচ্চারা সেই পরিবেশে আসবে, থাকবে আর শিখবে। শিশুর অন্তরের বিকাশ যেমন হবে, তেমনি তার বাইরের বিকাশও হবে। শরীরে মনে শিশু উন্নত হবে। শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি যাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়, সেটাও খেয়াল রাখা হবে। আর এই গোটা শিক্ষা পদ্ধতির মূল নীতি হলো শিশুকে শ্রদ্ধা করা, শৈশবকে শ্রদ্ধা করা, মনে প্রাণে বিশ্বাস করা মানব জীবনের সৃজনশীলতা বহুতায় রয় শৈশবের মধোই। শৈশবের প্রতি এই অসম্ভব বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে নতুন ধারার শিক্ষা ডাবনায় জোয়ার এনেছিলেন এক স্নায়ু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর নাম মারিয়া মন্টেসরি। মারিয়া ছিলেন ইতালির মানুষ। তিনি হলেন



প্রথম মহিলা, যিনি ডাক্তারি পাশ করেন। এক মানসিক হাসপাতালে কাজ শুরু করেন তিনি। তাঁর কাজ ছিল ওই হাসপাতালের মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েকটি শিশুর চিকিৎসা ও যত্ন করা। মারিয়া ওদের সেবা করতেন আর দেখতেন কী ভাবে শিশুগুলো নিজের অক্ষম অবস্থাকে অতিক্রম করে খেলাধূলা করে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর খেলার জন্য যে অদম্য ইচ্ছে মারিয়াকে তা বিস্মিত করে। তিনি ওদের ইন্দ্রিয়বোধগুলো সচেতন করে তোলার জন্য প্রচুর অনুশীলনী ও একসারসাইজ (শারীরিক ও মানসিক অনুশীলনী) করতে শুরু করেন। শিক্ষাতত্ত্ব নিয়েও তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। দার্শনিক – শিক্ষাবিদ রুশোর ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। আর শিক্ষা নিয়ে তাঁর তত্ত্ব, ভাবনা বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য তৈরি করেন একটা ছোটদের বাড়ি বা চিলড্রেনস হাউস। রোম শহরের এক কোণে সান লেরেঞ্জো বস্তি। সেই বস্তির পরিবেশে পরিবর্তন আনতে তৈরি করেন ছোটদের বাড়ি। বাবা-মা-অভিভাবকরা কাজে বেরিয়ে গেলে বস্তির গলিতে গলিতে খেলে বেড়ায়-ঘুরে বেড়ায় অ-গুন্তি বাচ্চা। তাদের নিয়ে শুরু হল “ছোটদের বাড়ি”। শিক্ষার হাত ধরে হবে মানব কল্যাণ; মানুষের জীবন ভালো হবে শিক্ষার সাহায্যে- এমন বিশ্বাস-ই তীব্র ভাবে জেগে উঠেছিল মারিয়ার মনে। “ছোটদের বাড়ি” প্রস্তুত হয়েছিল মারিয়ার শিক্ষণ ডাবনায়। প্রচুর শিক্ষণ – সামগ্রী সাজানো থাকত। বস্তির বাচ্চারা আসত, খেলত, ঐ সামগ্রীগুলো নাড়া চাড়া করত আর সেই সঙ্গে চলত শেখা। বাচ্চারা স্বাধীন ভাবে শিখত। মারিয়া বিশ্বাস করতেন শিশুর মন স্পঞ্জের মতো ও জল শুষে নেওয়ার মতো। শিশুমন হলো “বিশোষক”। শেখার পরিবেশ পেলেই সেই মন শেখার উপকরণ



খুঁজে নেয়। শিশু সৃষ্টি করতে করতে শেখে। শিশুর মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব আর আত্মবিশ্বাস বিকশিত করতে গেলে প্রয়োজন শিশুর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে তারা অবশ্যই শিখতে পারবে। সান লেরেঞ্জোতে এই কাজ শুরু করেন মারিয়া আর তার সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে।

মারিয়ার বৈজ্ঞানিক মন শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তাকে সংগঠিত করে। শিক্ষা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, মারিয়া ছিলেন তাঁদের একজন। শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন মারিয়া। সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে এক সুসংগঠিত কাঠামো দেন। মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষণ পদ্ধতিটি রূপায়িত হয় কিছু প্রামাণ্য শিক্ষণ সামগ্রীর



সাহায্যে। উপকরণের সাহায্যে তুলনামূলক ধারণা তৈরি হওয়া। পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে উপকরণ পেরিয়ে বিমূর্ত শেখার দিকে এগিয়ে যাওয়া। শিশুর নির্দিষ্ট আচার আচরণ ও পরিস্থিতি অনুসারে নানান উপকরণ রাখা থাকবে। শিশুদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা এই সব উপকরণ ব্যবহার করে নিজেরাই শেখার এক একটা পর্যায় অতিক্রম করবে।

আশা করা হয় এই মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে করতে শিশু স্বাধীন হতে শিখবে। তাই মন্টেসরি কাছে নিয়মানুবর্তিতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নয়। ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ম আবিষ্কার করে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ও সেই নিয়মকে অনুসরণ করে- এই আত্ম বা স্বয়ং নির্ভর শিক্ষাচর্চাই মন্টেসরি করে গেছেন। আর যেহেতু মন্টেসরি মানব জীবনে



বাল্যকালের গুরুত্ব অনুভব করেন তাই ছোট থেকেই শিশুদের মধ্যে এই স্ব-নিয়মানুবর্তিতার বোধের বীজ বপনের কথা বলেছেন। নানান বাস্তব - নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মাধ্যমে

ছোটদের মধ্যে ধৈর্য, যথাযথতার বোধ ও চর্চা করার মতো অনুশীলনীয় ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন মারিয়া। তিনি বিশ্বাস করেন যে এর ফলে শিশুদের মধ্যে মনঃসংযোগ বাড়ে, বৌদ্ধিক বিকাশ হয়।

মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতিতে অক্ষম ও বয়স্কদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা জায়গা পেয়েছে। “ছোটদের বাড়ি”-তে বয়ঃসন্ধির শিশুদের সঙ্গে এই বোধের চর্চা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হত। মারিয়া মন্টেসরি শিক্ষাভাবনায় জীবন রহস্যের প্রতি এক মুক্তমনা সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। মাইক্রোস্কোপের লেন্সের ভিতর দিয়ে কোন একটা জৈবিক অংশ দেখতে দেখতে পর্যবেক্ষকের মন নিজের মধ্যে প্রাণের খেলা চলছে তাতেই মেতে ওঠে। তাই মন্টেসরি প্রণীত শিক্ষণ সামগ্রীগুলো এমন হবে যেগুলো তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির হাত

ধরে ধরে পড়ুয়াকে বিমূর্ত বোধের দিকে নিয়ে যাবে। এই ভাবে পড়ুয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি তৈরি হবে। শিক্ষণ সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি গঠনে পরিবেশও বড় ভূমিকা পালন করে। মারিয়া মন্টেসরি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের উপর। এই সামর্থ্য ও শিশুর বিশেষক মন উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিকশিত হয়। মন্টেসরির কাছে

একজন ব্যক্তির শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার অর্থ হলো পরপর একাধিক বেশ কয়েকটি জন্ম নেওয়ার মতো ঘটনা। এই ক্রমান্বয়ে শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার পথে রয়েছে প্রচুর দুর্বলতা আর অজানা বাঁক। শিক্ষা প্রক্রিয়া ব্যক্তি মানুষের এই বড় হয়ে ওঠার চলাকে সুগম করে। মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা ভাবনা হলো তত্ত্ব আর চর্চার এক অপূর্ব মিশেল। তাঁর এই তত্ত্ব

চর্চার দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর চর্চা ভিত্তি পেয়েছে বৈজ্ঞানিক নীতির সাহায্যে। তাই বোধহয় মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতি এত সার্বজনীন মান্যতা পেয়েছে, গৃহীত হয়েছে।



এমো তাঁদের গল্প শোনাই

কবীর

“পথি পড়ি পড়ি জগ মুয়া
পণ্ডিত ভয়া না কোই
চাই অক্ষর প্রেম কা
পড়ে সো পণ্ডিত হয়ে।”

তীষণ একটা যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ - অথচ অস্ত্র নেই, শস্ত্র নেই, নেই তলোয়ার, নেই তীর। ব্যবহার হচ্ছে শুধু শব্দ, বচন, বাণী, দোহা। উল্টো পক্ষে রয়েছে পুঁথি, শাস্ত্র, ধূপ - ধুনো, তাগা - তাবিজ, মন্দির - মসজিদ, পণ্ডিত - পুরোহিত, কাজী - মৌলবী।

১৫০০ শতকের কাশী নগরী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পীঠস্থান। ছোঁয়া-ছুঁয়ি, জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ - নানা ধরণের আচার বিচারে সাধারণ মানুষের জীবন জেরবার। গরীব, নিচু জাতের মানুষেরা স্বস্তিতে নিশ্বাসও নিতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এমন অত্যাচার। অথচ এই শহরের এক কোণে একটি ছোট্ট কুটির। সন্ধ্যা হলেই কুটির প্রাঙ্গণে, সারাদিনের কাজ সেরে, দুদন্ড শান্তি পেতে জড়ো হয় মানুষগুলো। সাধারণ, খেটে - খাওয়া গরীব মানুষ - ছোট জাতের। গা ঘেঁষা ঘেঁষি করে বসে তারা। কথা শোনে, বচন শোনে। কথা বলছেন, দোহা বাঁধছেন যিনি। তাঁর কথা। কী বলছেন -

“কত মানুষ এলো গেলো
পুঁথি পড়ে পড়ে।
পণ্ডিত হওয়া হলো না।
প্রেম-এর আড়াই অক্ষর
পড়তে জানলেই
পণ্ডিত হওয়া যেত
সে তো আর জানা হলো না।”

সন্ত কবীর এ কী বললেন? চোখগুলো চক্ চক্ করে ওঠে। দোহা শোনার জন্য বাড়ির সামনে ভিড় বাড়তে থাকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভীমরংগের চাকে ঢিল পড়ল। কবীর জোলা। লহরতলাও - এর পাড়ে ফুটফুটে শিশুটাকে ঘরে আনে নিরু আর নিমা। সেই থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছেন। শিশুর নাম হয়েছে কবীর, মানে মহান। ছোট্ট কবীর বড় হচ্ছেন। জোলারা নিচু জাতের মুসলমান। তাঁত বোনা পেশা। গরীব ছোট জাত। তাই মৌলবী আর কাজীর চোখ রাস্তানি দেখে দেখে বড়



হচ্ছেন। প্রশ্ন জাগছে মনে। কত রকম ভেদ-ভেদ। হিন্দু-মুসলমান। ছোট জাত - বড় জাত। বড় লোক - গরীব লোক। মানুষ এক হয়েও এত রকম ফারাক? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চললেন। ধর্মশাস্ত্রে নয়। মানুষের মাঝে। হিন্দুত্বকে ছেড়ে, ইসলাম ছেড়ে - “খোঁজার” ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি। মানবজীবনের মানে কী, নিজেকে, ঈশ্বর - খুদা কোথায় - খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। মিশলেন মানুষের সঙ্গে, কথা বললেন। দোহা বাঁধলেন। অস্বীকার করলেন মন্দির মসজিদ - পূজা পাঠ - বেদ কোরান। জীবনযাপনে সহজ সাধারণ আর সং

- ভালো গুণগুলির চর্চাকে গুরুত্ব দিলেন।

“জাতি না পুছ সাধু কি,
পুছ লিজিয়ে জান
খোল করো তরয়ার কা
পড়া রজনে দো ম্যান।”

বাইরের খাপ - সাজসজ্জা পেরিয়ে অন্তরের প্রাণটাকে খুঁজতে বলেন তিনি। মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে যে ভক্তি আন্দোলন আর সুফী আন্দোলনের শ্রোত বইছিল তাতে কবীর জোয়ার আনলেন। সাধারণ মানুষ এই জোয়ারে গা ভাসালেন। মুখে মুখে কবীর রচনা করে চললেন রমৈনী, সবদ, সাখী! কবীরের বলা বাণীর নানান চেহারা। অবদমিত, অবহেলিত মানুষ খুঁজে পেলেন মুক্তির স্বাদ। মানব জীবনের দৈনন্দিনের কথা এই বাণীতে জায়গা করে নিল। সহজ ভাষায় মানুষ গভীর জ্ঞানের কথা জানতে পারল। বাইরের আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে প্রাণ-ই যে মহান, কবীর তাই শোনালেন।

নিজেকে জানতে চাওয়া মানেই পাশের জনকে বুঝতে চাওয়া। আর জানা - বোঝার মধ্যে দিয়ে একে অন্যের প্রতি আমরা সহনশীল হই, অ-হিংস হই, মিল খুঁজি, ভেদ ঘুচাই। সাধারণ চাষা-ভূষো, কুমোর, মজুর, শ্রমজীবী মানুষজনের জীবনে আশা - ভরসার আলো জ্বলে দিয়ে কবীরের প্রাণের আলো নিভে গেল- ১২০ বছরের দীর্ঘ জীবন পার করে মারা গেলেন সন্ত কবীর। রেখে গেলেন অগুনতি কবীর-পন্থীদের। যারা মানুষে মানুষে মিলনে বিশ্বাস করে। মৈত্রী আর শান্তিতে প্রত্যয় রাখে।

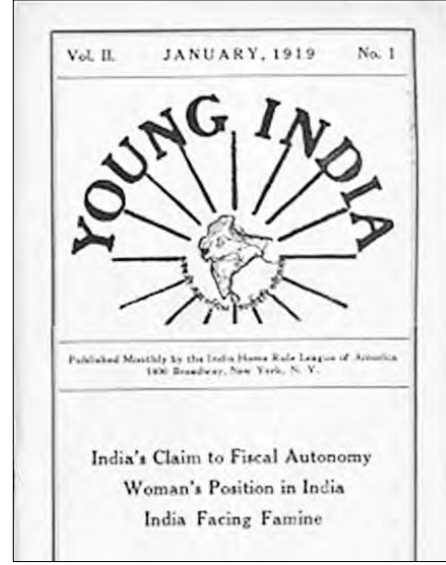
সংস্কৃতির অনুশীলন ছাড়া অন্তরের পূর্ণতা সাধন কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইয়ং ইন্ডিয়া

সবসময় যে আবশ্যিক শিক্ষার বিরোধীতা করব না এমন কথা নিশ্চিত করে বলতে পারিনা। তবে সমস্তরকম আবশ্যিকতাকে বা করতেই হবে এমন শক্তির প্রয়োগকে আমি ঘৃণা করি। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা শক্তি প্রয়োগ বা কোনও কিছু আবশ্যিক করলেই গোটা জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এরকমও আমি ভাবিনা। কিন্তু পান করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে চাইনা বলে আমি পানীয়ের জন্য নতুন দোকান খুলতে বিরোধীতা করি এবং পুরনো যেগুলো আছে সেগুলোও বন্ধ করতে চাই, তেমনই নিরক্ষরতাকে দূর করার ক্ষেত্রে আমি কি শিক্ষার যে বাধাগুলো আছে তা দূর করব ও আরও বেশি মুক্ত বিদ্যালয় খুলব এবং মানুষের চাহিদা মেটাতে তাদের আরও বেশি দায়িত্ববান করে তুলব। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মুক্তশিক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে আমরা কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোরও কোনও চেষ্টা করছি না। আমরা পিতামাতা বা অভিভাবকদেরও কোনও কিছু করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছি না। সাক্ষরতার মূল্য বিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণ প্রচার বা বিজ্ঞাপনও আমরা দিতে পারিনি।

আমার মতে আবশ্যিকতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষেত্রে এই সবগুলো বিষয় নিয়ে একত্রে ভাবা উচিত। এমনকি আমি এটাও নিশ্চিত নই যে আবশ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা যেখানে যেমন চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে যথাযথ সাফল্য পেয়েছে কিনা। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শিক্ষা চায়, তাহলে আবশ্যিকতা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। আর যদি এটা তা না হয় তাহলে আবশ্যিকতা ভীষণ ক্ষতিকর হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের তুমুল বিরোধীতা সত্ত্বেও কেবলমাত্র একটি স্বেচ্ছাচারী সরকারই আইন পাস করতে পারে। সরকার কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে? একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা আবশ্যিকতাকে চেপে ধরে বসে রয়েছে। আমাদের কোনরকম অনুমতি ছাড়াই একটা দেশ আমাদের জীবনকে বছরকমভাবেই শাসন করে। কিন্তু এখন এটা সেই সময়, যে সময়ে ভল্যান্টারি (voluntary) পদ্ধতিতে জাতিকে ব্যবহার করা যেতে পারে,



এমনকি যদিও দীর্ঘ সময় ধরে জাতির প্রতি এবিষয়ে প্রার্থনা, আবেদন ও পরামর্শমূলক ভাষণের পক্ষে কোনও সাড়া নাও পাওয়া যেতে পারে। সবাই বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত যে ভল্যান্টারি উদ্যোগে কোনও সংস্কারই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা বা সাফল্য পেতে পারেনা – এই ধারণা সমাজের প্রকৃত উন্নয়নে ক্ষতিকর ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এমন ভাবে তৈরি হয়ে থাকে বা প্রশিক্ষিত হয়, যা স্বরাজের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আমি আগের বক্তব্যে যা বলেছি, সেই অনুসারে আজ যদি আমরা স্বরাজ পাই, তাহলে আবশ্যিক শিক্ষার পরিবর্তনের পক্ষে অন্তত ভল্যান্টারি প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল, তার পরিবর্তনের পক্ষে লড়াই করে যাব। পাঠকদের একথা ভুললে চলবে না যে পঞ্চাশ বছর আগে যে নিরক্ষরতা ছিল, এখন ভারতে নিরক্ষরতার পরিমাণ তার চেয়েও অনেক বেশি। আর এই নিরক্ষরতা পিতামাতার অনিচ্ছার কারণে নয়, বরং বলা যায় পূর্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, বিদেশী পদ্ধতির অনুসরণের ফলে সেই সুযোগ সুবিধার বিলুপ্তি ঘটে এবং তার কারণেই এই নিরক্ষরতার বৃদ্ধি। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিদেশী পদ্ধতির আমদানী এই দেশের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়।

আর যেখানে কোনরকম ফী বা টাকাপয়সা ছাড়াই শিক্ষাকে একদম বাড়ির দোরগোড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বাবা-মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অবহেলা করছে – এথেকে এই ধারণা করাও যুক্তি সঙ্গত নয় যে বাবা-মায়েরা অধিকাংশ হয় মুর্থ, নতুবা হৃদয়হীন।

ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৪-৮-১৯২৪



নষ্ট তালিম এবং গান্ধীজীর শিক্ষা ভাবনা

আজ যদি আমরা গ্রামের কোনও স্কুলে গিয়ে বলি 'চলো আমরা স্কুলের সিলেবাসের পাশাপাশি যুগুরু শূকর, গারল ভেড়া, আর. আই.আর. মুরগী, খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস ইত্যাদি পালন করি'-অনেকে হয়তো রাগ করবেন বা বিরক্ত হবেন। খুব স্বাভাবিক, এসব কাজ করবো না বলেই তো স্কুলে এসেছি। কেননা এই শরীর-মন দিয়ে তৈরী হওয়া জীবিকাগুলি শুধু জটিল তাই নয় এর মধ্যে 'সম্মান'ও যেন বেশ কিছুটা কম। তাহলে আমাদের কাছে সম্মানজনক কি? আমাদের চিন্তায় - ধারণায় - মতাদর্শে যা শয়নে স্বপনে জাগরণে প্রতিনিয়ত ঘুরে ফিরে আসে তা হলো একটা সুন্দর, ছিমছাম, নিরুপদ্রব 'চাকরি'। এর জন্যই তৈরী হয়েছে বিদ্যালয়, পাঠশালা, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের দেশে ইংরেজরা এই বিদ্যালয়সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই। সিলেবাস, পঠন - পাঠন সমস্তকিছু খুব ভালো 'চাকুরে' হয়ে ওঠার জন্যই নির্মিত। এসবের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছিলো একটার পর একটা বশংবদ প্রজন্ম।

এই অচলায়তনে যিনি বা যাঁরা প্রথম কুঠারাঘাত করেন তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁরা আমাদের খুব ভালো ভাবে বুঝিয়ে ছিলেন এবং নিজেরা করে দেখিয়ে ছিলেন কিভাবে দেশের এবং গ্রাম-ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ হতে পারে। তাঁরা দুজনেই বলেছেন এই সমস্ত উদ্যোগ স্বরাজ আন্দোলনের বাইরে নয়।

আমাদের আজকের আলোচনা যা নিয়ে তা আমরা শিরো নামে যদিও মুখ্যত স্পষ্ট করে দিয়েছি, তবু বলতে হবে যে আমরা এই লেখার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, গান্ধীজীর 'নষ্ট তালিম' ভাবনার মূল প্রবেশ এবং প্রস্থান বিন্দুগুলি, আমরা দেখবো ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে এর সম্পর্কগুলি ঠিক কি ধরণের ছিল।

গান্ধীজী মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন একজন মানুষ যিনি নিজের রাজনীতি, মতাদর্শ-কে বারে বারে প্রশ্ন করেছেন, পথ পরিবর্তন করেছেন এবং মতাদর্শ-কে সূত্রায়িত করেছেন বিনা দ্বিধায়। আজ আমরা যদি চারদিকে তাকাই সেখানে কি দেখবো? সবাই লেখাপড়া করছে শুধু বস্ত্রগত প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য। অথচ গ্রামে যে পঞ্চগয়েত রয়েছে সেখানে যে রক্তজল করা পরিশ্রমে দিনরাত কাজ করে চলেছে একদল মানুষ, তাদের সম্পর্কে যদি গ্রামের হাইস্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের মতামত চাওয়া হয় তারা বলবে সে তো দুর্নীতির আখড়া। কিন্তু যদি তারা জানতো পঞ্চগয়েত এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহলে হয়তো পঞ্চগয়েতগুলি হয়ে উঠতো শিক্ষার অন্যতম উৎস। যে কারণে

গ্রামে যদি গবাদি পশুর মৃত্যু হয় তার কোন হেলদোল বিদ্যালয়ে বা তার ছাত্র-শিক্ষক সমাজে দেখা যায় না। গান্ধীজীর 'নষ্ট তালিম' এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে একটা মূর্ত প্রতীবাদ।

আসুন একটা 'Fantasy' দিয়ে শুরু করি। বাঁকুড়া পুরুলিয়া সীমান্তের একটি আপার-প্রাইমারী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ৮টি ক্লাস অথচ তিনটি ঘর। শিক্ষক দুজন, যখন জিজ্ঞেস করা হল এতে অসুবিধা হয় না? প্রধান শিক্ষক বললেন অসুবিধা? ঘর নেই বলে? না! বাইরে যে অনন্ত প্রকৃতি সেটাই তো আসল ক্লাস। এখানে সকালবেলায় প্রতিদিন একেকটি ক্লাস এর ছেলেমেয়েরা যায় স্থানীয় গ্রামের পরিবারে, সেখানে গিয়ে হাঁস-মুরগী-গরু-শূকর-খরগোশ এর পরিচর্যা তারা সহায়তা করে। মাঝে মাঝে সেখানেই শুরু হয় জলজ প্রাণীসম্পদ নিয়ে শিক্ষা। দুপুরে যখন স্থানীয় স্ব-নির্ভর দলের মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত রসুই ঘরে চলে ভোজের প্রস্তুতি, সেখানেও পালা করে উপস্থিত হয় ছাত্র ছাত্রীরা। সেখানে তারা শেখে রান্নায় নুন - তেলের সংযমী ব্যবহার, আলু-পটল কাটার পদ্ধতি। এগুলোই তো জীবনকুশলতা বা 'LifeStyle' যা গ্রামের জীবনযাপনে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অনেকে ভাবছেন এই 'Fantasy' দিয়ে আমরা আসলে বলতে চাইছি কি? আমরা বুঝে নিতে চাইছি গান্ধীজীর 'নষ্ট তালিম' ভাবনার প্রধান সূত্রটি। তাকেই, অর্থাৎ সেই শিক্ষাই তার কাছে 'নষ্ট' অর্থাৎ নতুন শিক্ষা, যা স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, যা উৎপাদনশীল শ্রম-কে উৎসাহিত করে, গ্রামে থাকার এবং বাঁধার মতো কুশলতা সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি গ্রামস্বরাজকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

অনেকের ধারণা আছে যে ১৯৩৭ সালের ওয়ার্ধা সম্মেলনের সময়েই বোধহয় গান্ধীজী শিক্ষা নিয়ে তার মতামত রাখেন, তা নয়। তিনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তলস্তয় ফার্ম-এর সাথে কাজ করছেন সেখানেই পল্লবিত হয়েছিল তাঁর নতুন শিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবনাগুলি। এই সব ভাবনাগুলি তিনি বিভিন্ন সময় যেভাবে লিখেছেন এবং বলেছেন সেখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় তার 'নষ্ট তালিম' এর তত্ত্ব। এর মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে তবে বলা যেতে পারে এ হলো অনেকগুলি উপাদানের একটি সংমিশ্রণ -

প্রথমতঃ নতুন শিক্ষা হবে দেশের মানুষের সংস্কৃতি এবং জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও তার মধ্যে প্রোথিত।

দ্বিতীয়তঃ এর প্রধান লক্ষ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠন করা।

তৃতীয়তঃ শুধু পাঠ্যবই-নির্ভর শিক্ষা নয়।

চতুর্থতঃ শিক্ষাকে হতে হবে পুরোপুরি ভাবে স্ব-নির্ভর।

পঞ্চমতঃ এই নতুন শিক্ষা যত্ববান হবে পড়ুয়ার সার্বিক বিকাশের জন্য।

ষষ্ঠতঃ এই শিক্ষা হবে পুরোপুরি ভাবে হাতের কাজ-কেন্দ্রিক। এগুলি গান্ধীজী হঠাৎ একদিন বসে ভেবে তৈরী করেননি।

এগুলি তিনি চলার পথে কখনো 'হিন্দ স্বরাজ' বা কখনো 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে ছিলেন।

গান্ধীজী ইভান ইলিচের অনেক পূর্বেই নির্বিদ্যালয়করণ বা de schooling - এর কথা বলে গিয়েছেন। তিনি আমাদের দেশের সেই বিরল শিক্ষা দার্শনিকদের অন্যতম, যিনি শিক্ষাকে ভাবতে পেরেছিলেন তথাকথিত শিক্ষালয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে। যে কারণে শিক্ষাকে যখন বাধ্যতামূলক করা হয়, তখন তিনি তা মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

এবারে আমরা একটু দেখবো 'নঈ তালিম' - এর প্রধান সূত্রগুলির ব্যাখ্যা কি ধরণের হতে পারে। তিনি খুব দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেছেন যে পাঠক্রম এবং শিখন প্রণালী পরাধীন ভারতে প্রবহমান ছিলো, তা শুধু আমদানীকৃত। তাই নয়, বরঞ্চ তা বহু সময় দেশ এবং জাতির স্বার্থের পরিপন্থী। এখানে যে শিক্ষা 'বিতরণ' করা হয় তা শুধু মাত্র কৃত্রিমতা দিয়ে ভরা তাই-ই নয়, সেখানে এমন অনেক উপাদান বিদ্যমান যা আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এর পাশাপাশি তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়াটি- মুক্তমন, মুক্তমেধা, মুক্তবুদ্ধির জন্য দরকার গুণমান

সম্বলিত শিক্ষা - এটা ঠিক আজকের IIT - IIM থেকে নিঃসৃত কথা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না। আজ যখন 'Quality Education'-এর কথা কেউ বলে সেখানে ৯০% ক্ষেত্রে বোঝাতে চাওয়া হয় বর্তমান বাজারের সাথে সেই শিক্ষা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানেই গান্ধীজীর সার্থকতা। তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন সেই বিশেষ মতাদর্শ যেখানে শিক্ষা হবে বাজার নয়, গ্রামমুখী।

বিগত শতাব্দীর প্রধানত দুই এবং তিনের দশকের এই সব ভাবনাগুলি গান্ধীজী তুলে ধরেছিলেন ওয়ার্থা সম্মেলনে। আর তারপর তাঁর ভাবনা অনুযায়ী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি খোলা হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে চরকা, গ্রামীণ হাতের কাজ ইত্যাদির ওপরে প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে এই ধরণের বিদ্যাচর্চা সেদিনের ভারতবর্ষে খুব যে জোরের সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এমন নয়। সেগুলি তখন অনেকটাই প্রান্তিক নিরীক্ষা হিসেব থেকে যায়। তবে আমাদের ভাবতে ভালো লাগে, যে রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মার শিক্ষাদর্শনের পার্থক্য এই সময় অনেকটাই ঘুচে গিয়েছিলো।

তবু আজ সময় হয়েছে মহাত্মার দর্শন নতুন করে বোঝার।

কোচবিহার জেলায় ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত হলো ছাত্রছাত্রীদের জন্য সৃজন মেলা



সৃজনশীলতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই সৃজনশীলতার মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতার অগ্রগতি। প্রকৃতপক্ষে শিশুবয়স থেকেই এই সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সেই সৃজনশীলতার যে স্বাভাবিক বিকাশ, তা নানা কারণে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর এই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার যে উদ্যোগ তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর এই শিক্ষাব্যবস্থা হল গতানুগতিক ও যান্ত্রিক। সর্বোপরি এই শিক্ষা হল চাকরীমুখী। চাকরীমুখী এই শিক্ষায় সৃজনশীলতার কোনও স্থান নেই। এই গতানুগতিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে বেরিয়ে এসে সম্প্রতি আয়োজিত হল এক অভূতপূর্ব মেলা, যা কিনা শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় উদ্যোগ। শিশুদের সৃজনক্ষমতা

বিকাশের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটি হল - ছোটদের সৃজন মেলা। কোচবিহার জেলার অন্তর্গত ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এই মেলাটির আয়োজন করা হয়। মেলাটি আয়োজন করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সহযোগিতা করেন অ্যাডেড ইনিশিয়েটিভস এবং দেওয়ানহাট জনকল্যাণ সমিতি। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সংলগ্ন প্রাঙ্গণেই এই সৃজন মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, জুনিয়র ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি রয়েছে, সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই সৃজন মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নাচ একক ও সমবেত, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা, অঙ্কন, ব্যায়াম, নাট্য অভিনয় এবং নিজেদের হাতের তৈরি বিভিন্ন কাজের প্রদর্শনসহ

এই সৃজন মেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নিজেদের সৃজনক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং তাদের আনন্দে সামগ্রিকভাবে সৃজন মেলাটি আরও বেশি চাঞ্চল্যময় এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যালয় নামক চার দেওয়ালের যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের এই উচ্ছ্বাস, সর্বোপরি তাদের এই নির্মল ও সীমাহীন এক মুক্ত আনন্দ আমাদের সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহু দিন। সত্যি কথা বলতে কি, শিশু বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে যে সৃজনশীলতার উদ্ভব হয় এবং শিশুরা তথা ছাত্র-ছাত্রীরা যে সৃজনশীল কিছু করতে পারে, তাদেরও যে সৃজনক্ষমতা রয়েছে, সেই সৃজন ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে এই সৃজন মেলার উদ্যোগ ও আয়োজন হল ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষেও একটি অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের এই সৃজনক্ষমতার বিকাশে গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিরও যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি যে সেই ভূমিকা পালন করতে পারেও, এই সৃজন মেলা তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকল। এই সৃজন মেলার উদ্যোক্তা ও সহযোগী দুই সংস্থার পক্ষে এটাও আশা করা হয়েছে যে এই সৃজন মেলার অনুপ্রেরণায় অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও তাঁদের নিজ নিজ পঞ্চায়েত এলাকায় শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এধরণের আরও অনেক সৃজন মেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনক্ষমতার বিকাশে শিশুদের অনুপ্রাণিত করবেন। এখানে আমাদের একথা স্মরণে রাখা দরকার যে আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন এই নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষাকে শিশুর কাছে আনন্দময় করে তোলার ব্যবস্থা করতে পারে। তাই শুধু শিক্ষা বা পাঠ নয়, শিশুদের সৃজনক্ষমতা বিকাশের তথা তাদের হাতে কলমে কাজ

করারও পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আর এই হাতে কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে গতানুগতিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব হবে, যা কিনা শিশুর কাছে যেমন আনন্দময় হয়ে উঠবে, তেমনি তার সৃজনক্ষমতারও বিকাশ ঘটবে। পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশুরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারবে। এদিনের এই সৃজন মেলা সেই সৃজনক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপও বলা যেতে পারে।

এদিনের এই সৃজন মেলা উদ্বোধন করেন ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী গোলাপী রায় (সরকার) এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীমতী রিম্পা দাস। উদ্বোধনী ভাষণে পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতী গোলাপী রায়(সরকার) বলেন যে, শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনক্ষমতার বিকাশে শিশুদের জন্য গ্রামপঞ্চায়েতগুলির অনেক কিছু করার রয়েছে। তবে শিক্ষা এবং সৃজন ক্ষমতা উভয়ক্ষেত্রেই গ্রামপঞ্চায়েত এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি শিশুর অভিভাবকদেরও বিশেষ সচেতন হতে হবে। শিশুদের শিক্ষা ও সৃজনক্ষমতার বিকাশে পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে ভবিষ্যতেও তিনি যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে এদিন জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জিল এক্রাম মহাশয়। তিনিও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন এই মেলার প্রাসঙ্গিকতা, পাশাপাশি তিনি অঙ্গীকার করেন সর্বোত্তমভাবে এই মেলাকে পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হবেন। এদিন ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী প্রত্যাষ কুমার মোদক এবং শিক্ষা সঞ্চালিকা শ্রীমতী হালিমা বিবি দুজনেই তাঁদের বক্তব্য রাখেন। তাঁরা দুজনেই স্বীকার করেন যে শিশুদের মধ্যে সৃজনক্ষমতা রয়েছে এবং তার বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। আর এজন্য তাঁরা দুজনেই যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাসও দেন।



ছাত্রছাত্রীদের
নাটক



ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ



ছাত্রীদের
নাচ

শান্তিনিকেতনে সারাদিনব্যাপী আলোচনা ও ভাবনা বিনিময় শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিশার সন্ধান ও উদ্যোগ গ্রহণ

স্বচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের উদ্যোগে গত ১লা নভেম্বর ২০১৪ তারিখে “নব প্রবর্তিত বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে অডিও - ভিসুয়াল মাধ্যমের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা এবং শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতার পরিসর বৃদ্ধিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সহযোগী ভূমিকা “শিরোনামে সারাদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোলপুর শহরের গীতাঞ্জলী অডিটোরিয়ামে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের উদ্যোগে নবদিশা-র পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনাচক্রটি হল প্রচলিত গতানুগতিক ও যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে নব দিশা অর্থাৎ বিকল্প একটি নতুন দিগনির্দেশের ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ উদ্যোগ। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে এই আলোচনাচক্রটি আরও বেশি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। আলোচনা চক্রের শুরুতেই অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রত্নদীপ দে নবদিশা-র পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনাচক্রের প্রাসঙ্গিকতা উত্থাপনের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণকে স্বাগতম জানান এবং উপস্থিত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা এবং নবদিশার উদ্যোগ প্রসঙ্গে” শীর্ষক একটি চলচ্চিত্রও এদিন উপস্থিত সদস্যদের সামনে প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্রটি উপস্থাপন করেন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের এডুকেশন বিভাগের প্রজেক্ট ডিরেক্টর শ্রী স্বপন দাস। এছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত ও অডিও ভিসুয়াল তৈরি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও উপস্থাপনে বিশেষ সহায়তা দেন সংস্থার দুই কর্মী শ্রী অরুণেশ মজুমদার এবং শ্রী সুমিত সান্যাল।

সারাদিনব্যাপী এই আলোচনাচক্রে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের কাজের এলাকা দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা যেমন উপস্থিত হয়েছিলেন, তেমনি বিভিন্ন স্বচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গের উপরোক্ত জেলাগুলি থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের কর্মী সদস্যদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সমগ্র আলোচনাচক্রটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এদিনের এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয়ে অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমের গুরুত্ব এবং

তার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগনির্দেশের সম্ভাবনা স্বীকার করেন। পাশাপাশি কোন কোন পাঠ্য বিষয় নিয়ে অডিও ভিসুয়াল তৈরি করা দরকার তার একটি প্রাথমিক তালিকাও তাঁরা এদিন উপস্থাপন করেন এবং বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই আলোচনার সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যরাও সহমত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমের ব্যবহার

অত্যন্ত জরুরী, কারণ অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে এই অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম শিক্ষা প্রসারে অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁরা সবাই আরও বিস্তারিত ভাবে বলেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষা নয়, বা শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে জীবনমুখী করে তুলতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের পাঠ্যবিষয় গুলিকে

সহজবোধ্য করার পাশাপাশি তাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। আর সহজবোধ্য ও আনন্দময় করে তুলতে পারলে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও কাজে লাগবে। এক্ষেত্রে একমাত্র অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমই তাদের পাঠ্যবিষয়কে সহজবোধ্য ও আনন্দময় করে তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের হাতেকলমে কাজ শেখানোর বিষয়েও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেও শিখবে এবং তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্বনির্ভর হওয়ার পথও প্রশস্ত করবে। এই আলোচনায় কিচেন গারডেনিং বা পুষ্টি বাগান, ফুল ও ফলের বাগান তৈরি করা ও তার পরিচর্যা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়।

উপযুক্ত জীবনমুখী শিক্ষার প্রসারে শুধু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরই ভূমিকা আছে তা নয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েতেরও যথেষ্ট ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা প্রসারের এই প্রয়োজনেই ৭৩ এবং ৭৪ তম অ্যাগেন্ডামেন্টে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপস্থিত সদস্যরা কে কিভাবে শিক্ষার প্রসারে বিদ্যালয়গুলিকে সহায়তা করছেন তা নিয়ে নিজেরাই বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও



গ্রামপঞ্চগয়েতগুলি সহায়তার হাত আরও কিভাবে প্রসারিত করতে পারেন এদিন তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে শিক্ষায় পঞ্চগয়েতিরাজ ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন এই আলোচনাচক্র উপস্থিত দুই বিশিষ্ট সম্মানিত সদস্য প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী প্রসাদরঞ্জন রায় ও রাজ্য অর্থ কমিশনের সদস্য শ্রী দিলীপ ঘোষ এবং নব প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী ও গ্রামীণ প্রেক্ষিতে তার বাস্তবসম্মত রূপ প্রসঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং মাননীয় শিক্ষক শ্রী দেবাশিস মণ্ডল

। সশরীরে উপস্থিত থেকে সমগ্র আলোচনাচক্রটিকে সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কর্মীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী আবীর চক্রবর্তী। সারাদিনব্যাপী এই আলোচনাচক্রটিকে সৃষ্টি ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রত্নদীপ দে। পুরুলিয়া থেকে আগত সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে একটি ঝুমুর গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে একদিনের এই আলোচনাচক্রের আপাতত সমাপ্তি হয়।

কালচিনি পঞ্চগয়েত সমিতির উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী আলোচনা ও ভাবনা বিনিময়

কালচিনি পঞ্চগয়েত সমিতির উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাগেড ইনিশিয়েটিভস ও নর্থ বেঙ্গল ধুমকুড়িয়া অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের যৌথ সহযোগিতায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখার (২০০৫) প্রেক্ষিতে তার প্রাসঙ্গিকতা এবং অডিও ভিসুয়ালের প্রয়োজনীয়তা” শিরোনামে সারাদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনিতে অবস্থিত সাবিত্রী ধর্মশালার সভাকক্ষে আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা হলেন কালচিনি ব্লকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ও কালচিনি পঞ্চগয়েত সমিতির পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাপতিও সশরীরে উপস্থিত হয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটির মঙ্গল কামনা করেন এবং এই আলোচনাচক্রের যে শিক্ষা ভাবনা রয়েছে তা আরও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি এদিন সর্বতোভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিন কালচিনি পঞ্চগয়েত সমিতির পক্ষে শ্রী প্রেম লামা (কর্মাদক্ষ, শিক্ষা - সংস্কৃতি - তথ্য ও ক্রীড়া বিভাগ) উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণকে স্বাগতম জানান এবং কালচিনি পঞ্চগয়েত সমিতির পক্ষে তিনি সমগ্র আলোচনাচক্রটি পরিচালনা করেন। আলোচনাচক্রের শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়পর্ব (self introduction) অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও কালচিনি পঞ্চগয়েত সমিতির সদস্যরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তথা শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কিছু মতামতও উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতামতগুলি হলঃ (ক) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন জরুরী। (খ) ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ আউট কিভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে

উপযুক্ত চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। (গ) অভিভাবকদেরও শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট সচেতনতা থাকা দরকার (ঘ) শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। (ঙ) শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা - এই ধরনের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন প্রয়োজন। (চ) শিক্ষার পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পড়ুয়াদের কিভাবে যুক্ত করা যায় তা ভাবতে হবে। (ছ) পাঠ্য বিষয়কে আরও সহজ সরল করার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তা আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।



এরপর মূল আলোচনা পর্বে কালচিনি সার্কলের এস আই অফ স্কুলস শ্রী সুরজিৎ পাল বলেন যে প্রকৃত অর্থেই শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধু হতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি আরও নানা বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তুলতে হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাপনে কাজে লাগবে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ছাত্র হিসেবে অনেক ভাল হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে ব্যর্থ হওয়ায় মারাত্মক পরিণতি নেমে এসেছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তার কারণ হল ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে এমন শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়নি।

শ্রীমতী আশা নারজিনারি (কর্মাদক্ষ, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ) তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যে সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে আসছে, সেই সামাজিক পরিমণ্ডলের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

শ্রী বারীন কুমার পাল, এ আই অফ স্কুলস, কালচিনি সার্কলের বিস্তৃতভাবে বলেন যে স্কুলগুলিতে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে। এর মূল কারণ দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্যের অবসান ঘটতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শ্রীমতী রোশনি বাগোয়ার (কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ) তাঁর ভাষণে বলেন যে শিক্ষার মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তবু এখনও দেখা যায় যে শিক্ষার প্রতি মানুষের অনীহা, ড্রপ আউটের সংখ্যা বৃদ্ধি – এই বিষয়গুলির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। যাঁরা SSK কর্মী হিসেবে কাজ করেন, তাঁদেরকে এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে শ্রী সমীর নারজিনারি (চেয়ারম্যান, ডিসট্রিক্ট প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিল, আলিপুরদুয়ার) এদিন বলেন যে এই ধরনের আলোচনাচক্রে শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাদেরও অংশগ্রহণ জরুরী। তাদেরও সচেতনতা জরুরী। এদিন শ্রী অপূর্ব রায় (SEO, কালচিনি



পঞ্চগয়েত সমিতি) শিক্ষা ক্ষেত্রে ঠাকুর পঞ্চগননের অসামান্য অবদানের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষাকে তথা পাঠ্যবিষয়কে আরও সহজবোধ্য করে তোলার ক্ষেত্রে অডিও-ভিসুয়ালের গুরুত্বও উল্লেখ করেন। শ্রী অপূর্ব রায় এদিন পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে নিজের পরিবেশ, নিজের পারিপার্শ্বিক এলাকা, নিজের জীবনযাপন থেকেও কিভাবে শিক্ষা নিতে পারি তারও উল্লেখ



করেন। রাস্তার ধারে মাইলস্টোন দেখে দেখে বিদ্যাসাগর বালক বয়সে কিভাবে ইংরাজি সংখ্যা শিখেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের যে মূল ভাবনা তা নিয়েও এদিন একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন শ্রী প্রেম লামা। এদিন “বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার সন্ধান” শিরোনামে একটি চলচ্চিত্রও উপস্থিত সদস্যদের সামনে প্রদর্শিত হয়। এই চলচ্চিত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের

শিক্ষা ভাবনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে ভাষ্যপাঠ করেন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের এডুকেশন বিভাগের প্রজেক্ট ডিরেক্টর শ্রী স্বপন দাস। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ অনুযায়ী শিক্ষা ভাবনাকে সাতালি এবং মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চগয়েত এলাকায় কিভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের পক্ষে একটি তথ্যচিত্রও এদিন প্রদর্শিত হয়। এই আলোচনাচক্রে আরও দুটি বিশেষ উপস্থাপন হলঃ (১) “জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫” থেকে নির্বাচিত কিছু অংশের পাঠ। পাঠ করেন ও প্রয়োজনীয় অংশ বিশ্লেষণ করেন শ্রী প্রেম লামা। (২) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশের পাঠ। পাঠ করেন শ্রী স্বপন দাস এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন শ্রী অরুণেশ মজুমদার।

এদিন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রত্নদীপ দে এই সভাটিকে যাত্রাপথের শুরু বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে প্রচলিত গতানুগতিক ও যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে সবাই মিলে বিকল্প শিক্ষা ভাবনাকে সামনে রেখে যদি নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করা যায়, নিশ্চয় সফল পাওয়া যাবে। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, নিজেদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়াতে হবে – তাতে নিজেদের অভিজ্ঞতা



বাড়বে, নিজেদেরও শিক্ষা হবে। প্রকৃতপক্ষে তা হবে এক নব দিশার উন্মোচন।

এদিন সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী দেবশিস মণ্ডল প্রথমেই বলেনঃ “পড়াশোনার ভাষা হবে জীবনকেন্দ্রিক, তা চাপিয়ে দিলে হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যে যা কাজ করছে বা পারছে, তার প্রশংসা করতে হবে। তবেই সে সেই কাজটা আরও ভাল ভাবে পারবে ও শিখবে। অর্থাৎ শিশুটির সঙ্গে শিক্ষককে interaction বাড়াতে হবে। আর শিশুদের সঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আপনি তখনই interacting আগ্রহী হবেন, যখন আপনিও আনন্দে থাকবেন, চাপমুক্ত থাকবেন।” পরিশেষে শ্রী দেবশিস মণ্ডল বলেনঃ “Joyful learning কে promote করতে হবে। শিক্ষক যদি আনন্দে থাকেন, তাহলে সেই শিক্ষকই Joyful learning কে ensure করতে পারবেন।” সভার পরিচালক শ্রী প্রেম লামা উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে এই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

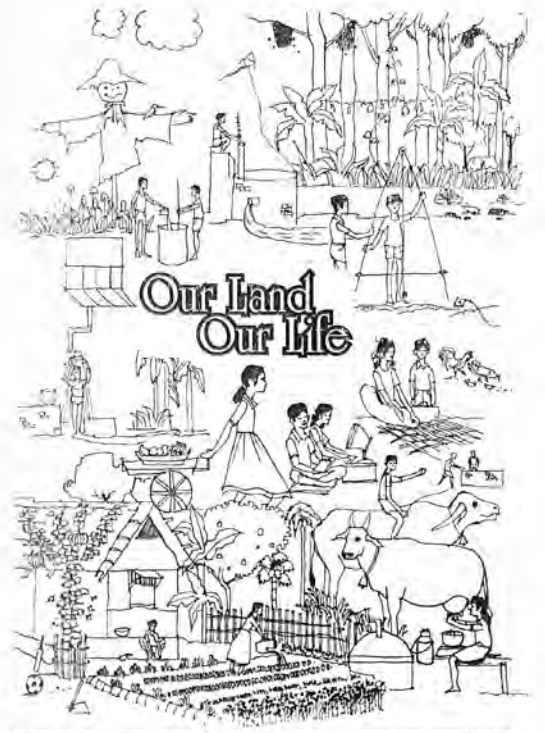
‘আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার লাইফ’

গ্রামের শিশুদের উপযোগী পাঠক্রম (Curriculum) এবং পাঠ্যসূচী (Syllabus) তথা বিকল্প শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সম্প্রতি একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ‘আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার লাইফ’ নামক এই বইটিতে শিশুদের উপযোগী পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী নিয়ে যে নতুন চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা এক কথায় অনবদ্য। পাশাপাশি আরও বলা যায় যে শিশুদের উপযোগী পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী নিয়ে নতুনতর ভাবনায় সমৃদ্ধশালী এই বইটি আমাদের চিন্তাভাবনাকেও যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনি আমাদের আগামী দিনে এগিয়ে চলার পথকেও প্রশস্ত করবে। সত্যি কথা বলতে কী, এই বইটিতে রয়েছে সেই এগিয়ে চলার বার্তা।

‘নবদিশা’-র মাধ্যমে আমরাও সেই এগিয়ে চলার বার্তা পোষণ করি। বিকল্প শিক্ষা নিয়ে নবদিশা-র চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগের সঙ্গে এই বইটির চিন্তাভাবনার মিল এখানেই। ‘আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার লাইফ’ বইটিতে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা হয়েছে, এখন যে পাঠক্রম বিদ্যালয়ে চালু রয়েছে বা যে পাঠক্রম এখন বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় তা পুরোপুরি শহরকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, এই পাঠক্রম অনেক জলন্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন বিশ্ব-উষ্ণায়ন, পরিবেশগত ভাঙন, এবং ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নেবার জন্য রক্তাক্ত লড়াই ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং বিদ্যমান দারিদ্র্য। এছাড়াও বলা হয়েছে শিক্ষক ছাত্রদের আদানপ্রদান এখন পূর্ব নির্ধারিত কিছু তথ্য- বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছে আসলে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাঠক্রমের পিছনে কাজ করছে আলোকায়নের ধারণা ও তার প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এবং আনুগত্য। সেজন্য প্রাক-আলোকায়ন সমস্ত চিন্তা আধুনিক পাঠক্রমে ব্রাত্য বলে বিবেচনা করা হয়।

এই বইটিতে পূর্ণাঙ্গ দশ বছরের পাঠক্রম নির্মাণে যে অসাধারণ মুস্লিয়ানা দেখানো হয়েছে তা সত্যিই অনবদ্য। প্রথম পাঁচ বছরে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে ভাষা এবং পাটীগণিতের ওপরে। তার পরের দুবছরে প্রধান পরিবর্তন হয়েছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখার বদলে বিমূর্ত জ্ঞানের পরিসর আয়ত্ত করার মধ্যে।

আর শেষ তিনবছরে আগের সাত বছরের পাঠ সংহত করার পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার ওপরে।



A curriculum for children of rural communities in India

এই ধরনের পাঠক্রমের এর মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এটি সেই সব শিশুদের বাস্তব প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখে নির্মাণ করা হয়েছে যারা কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে জীবন-জীবিকা গড়ে তুলতে চায়। এই পাঠক্রম গ্রাম-ভারতের শিশুদের সামনে তুলে ধরবে একটা বিকল্প ভবিষ্যতের ছবি, যেখানে তারা বাস্তবসম্মত ভাবে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর পাশাপাশি এই ধরনের পাঠক্রম তৈরীর একটা বৃহৎ লক্ষ্য শিশুদের প্রাক-আলোচনা ধারণা এবং ব্যবস্থাগুলি প্রসঙ্গে আরো ওয়াকিবহাল এবং বিশ্লেষণ মুখর করে তোলা এবং তাদেরকে সেই ভাবনা ভাবার জন্য প্রস্তুত করে তোলা, যেখানে তারা নিজেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা, যা এই সময়ের উপযোগী, সেগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

পুরো পাঠক্রমে গুরুত্ব পেয়েছে কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে শিক্ষা এবং অনুশীলন। খুব দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষায় অনেক গ্রামীণ জীবনযাত্রার প্রাসঙ্গিক ছবি তুলে ধরা হয়েছে এবং কাজকর্মের ‘মধ্য দিয়ে তার সম্পর্কে ছাত্রদের সক্রিয় ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকী। ‘নবদিশা’ এধরনের ভাবনা নিঃস্বার্থ ভাবে সম্প্রসারিত করতে দায়বদ্ধ, অঙ্গীকারবদ্ধ।

“ জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ ”

কিছু নির্বাচিত অংশের সংকলন

(“জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫” এর বাংলা সংস্করণ অনুযায়ী পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।)

শিশুদের কী রকম শিক্ষা আমরা যোগান দিচ্ছি?

পড়ুয়াদের বাস্তব জীবনের কাজ- কর্মে বিদ্যালয়ের অর্জিত শিক্ষাকে লাগানো যাচ্ছে না। পরস্পর আলাদা থেকে যাচ্ছে।

(পৃষ্ঠা ২)

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার দিকটি দুর্বল হয়ে পড়ছে। পরীক্ষার পড়া এই কাজে আছে খানিক যান্ত্রিকতা। যা শিশুর শৈশবকে পীড়িত করে। এই প্রকার প্রথাগত লেখা-পড়ার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই বললেই চলে।

(পৃষ্ঠা ৩)

পঞ্চগয়েতের ছত্রছায়ায় শিক্ষা সম্পাদনের ইতিবাচক দিকগুলি প্রসঙ্গে ‘রূপরেখার’ মত

তিয়াত্তর এবং চুয়াত্তরতম সংশোধন হয়েছে আমাদের সংবিধান। সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় কমিটিকে, যাতে স্থানীয় শিশুদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিটিগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে।

(পৃষ্ঠা ৮)

গ্রাম স্তরে বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সমান্তরাল ভাবে কাজ করতে পারে তার উপযোগী একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে পঞ্চগয়েতীরাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১২০)

- ১) শিক্ষাব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠার ঝোঁক কমে যায়।
- ২) পড়ুয়াদের যথাযথ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেক বেশি দায়বদ্ধ হন।
- ৩) বিদ্যালয়গুলি যথেষ্ট ভাবে স্ব-শাসনের ক্ষমতা অর্জন করে।
- ৪) পড়ুয়াদের চাহিদার প্রতি অনেক বেশি নজর রাখা যায়
- ৫) স্থানীয় জনজীবন, প্রকৃতি-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে জানার উদ্দীপনা বাড়ে।
- ৬) নিজস্ব পরিবেশে পড়ুয়ারা বিভিন্ন সামর্থ্য অর্জনের অধিকারী হয়।
- ৭) পড়ুয়ারা চারপাশের পরিবেশ, জীবন ও জগৎ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
- ৮) পর্যবেক্ষণ করা বিষয়ের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যসূচি নির্ভর বিষয় ও তথ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন সহজ হয়।

(পৃষ্ঠা ৫)

ভাষা

শিক্ষকরা স্থানীয় ব্যবহারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ সুগম করা, ভাষা শেখান, এবং

শেখানোর কাজে ব্যবহারযোগ্য বিষয়বস্তু তৈরি করার ক্ষেত্রে ইনপুট (input) চাইতে পারেন।

(পৃষ্ঠা ৮৭)

একটি বিশেষ পাঠক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গোষ্ঠীকে সরাসরি কাজে লিপ্ত করার সম্ভাবনাগুলি স্কুল খতিয়ে দেখবে। এই সম্পর্ক স্থাপনটা প্রতিষ্ঠানগত শিখনের বিষয় ও শিখন পদ্ধতির অংশগ্রহণকে সাহায্য করবে। আর একটি জরুরী বিষয় হলঃ জন্মাবধি যে ভাষার সঙ্গে এই পর্বের শিশুদের পরিচিতি, সেই ভাষাতেই শেখাতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৬৩)

শিশুদের জ্ঞান ও স্থানীয় জ্ঞান

স্থানীয় পরিবেশ এবং শিশুর গোষ্ঠী – উভয়ে মিলে যে প্রাথমিক ক্ষেত্রটি গড়ে তোলে, তার মধ্যে শিক্ষাদানপর্ব অনুষ্ঠিত হলে তা তাৎপর্য অর্জন করে।

(পৃষ্ঠা ২৭)

শিক্ষা ভবিষ্যৎ গোষ্ঠীজীবনে যুক্ত না হলে তা ফলপ্রসূ নয়, তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

(পৃষ্ঠা ২৮)

মনে রাখতে হবে – স্থানীয় পরিবেশ শুধু কোনো ভৌত বা প্রাকৃতিক জগতে গড়া নয়। এর মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতও রয়েছে। পার্থিব সম্পদে গোষ্ঠী-জীবন উপচে পড়ে। স্থানীয় গল্প, গান, তামাশা, ঠাট্টা, এর সঙ্গে শিল্পকলা সবই বিদ্যালয়ের জ্ঞান ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মৌখিক ইতিহাসের একটা সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তাদের রয়েছে। আমরা নীরব থেকে তাই দিয়ে শিশুদের সরব করতে পারি।

(পৃষ্ঠা ২৯)

প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ মিথস্ক্রিয়া এবং সেই সম্পর্কিত বোধ – হাতেকলমে কাজ করা – সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞান – ব্যক্তিগত নান্দনিক দক্ষতা – এসবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

(পৃষ্ঠা ৩০)

স্থানীয় অঞ্চলে ‘স্থানীয় জ্ঞান’/দেশজ ও অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং যেখানে সম্ভব বিদ্যালয়ের জ্ঞানের সাথে তাকে যুক্ত করা।

(পৃষ্ঠা ৩১)

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষার আধেয়, পদ্ধতি এবং ভাষা - শিশুটির বয়স এবং বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের

মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া দরকার যাতে বিদ্যার্থীর অনুসন্ধিৎসা এবং সৃজনশীলতার লালন পালন করা যায়।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিশুর বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে সে যথেষ্ট কর্মমুখী দক্ষতা সহকারে কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারে।

সমগ্র স্কুল পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার বোধ জাগ্রত করতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯)

সমাজ বিজ্ঞান

পরীক্ষার প্রয়োজনে নিছক কিছু সারবাঁধা তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে তাত্ত্বিক অনুধাবনে চিন্তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন। যাতে শিশুদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতায় দক্ষ করে তোলা যায় এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্নের যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে।

(পৃষ্ঠা ১১৯)

স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা

শিক্ষার্থীর সমগ্র উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা, স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষার (যোগ ব্যায়াম সহ) আকর্ষণের মধ্য দিয়ে স্কুলের ভর্তি, ধরে রাখা, এবং স্কুল সমাপ্ত করার সমস্যারও কিছু সমাধান হতে পারে।

(পৃষ্ঠা ১১৯)

তবে মনে রাখতে হবে – এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাটি হলঃ খেলা, একক এবং দলগত স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে বাস্তব সংযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, দক্ষতা এবং শারীরিক গঠনের বিকাশ ও তার অভিজ্ঞতা।

(পৃষ্ঠা ৫৫)

স্থানীয় অঞ্চল থেকে খেলা এবং দৌড় প্রতিযোগিতার জন্যে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

খেলাধুলার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এমন ভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে যাতে অবকাশের সময় খেলাধুলা করার জন্যে আরও বেশি সংখ্যক শিশু এখানে আসে এবং দলগত ভাবে খেলা যেন খেলতে পারে। যেমন, ফুটবল, বাস্কেটবল ছোঁড়া, ভলিবল এবং নানান স্থানীয় খেলা।

(পৃষ্ঠা ৫৫)

আমাদের দেশে বেশির ভাগ শিশু- প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে একেবারে বিদ্যালয়ের উচ্চ-মাধ্যমিক পর্ব পর্যন্ত অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের শিকার।

(পৃষ্ঠা ৫৪)

ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৫৫)

প্রচুর বন্য গাছপালা, ফল, শস্য উপজাতি গোষ্ঠীর দৈনিক আহারে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির উপকরণ-সরবরাহ করে। পুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্ম পরিকল্পনার একটা মূল্যবান

উপাদান হতে পারে।

(পৃষ্ঠা ৬২)

হাতে কলমের কাজ (কর্ম এবং শিক্ষা)

পুঁথির শিক্ষা এবং হাতে- কলমে কাজ পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হলে অনুসৃত শিক্ষার পদ্ধতি এবং কাজের হাতিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর সৃজনশীলতার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ পরিবারে গৃহস্থালির কাজ এবং পারিবারিক পেশা বা জীবিকা নির্বাহের একটি উপায়। আমাদের দেশে মুংশিল্পী, হস্তশিল্পী, তন্তুবায়, কৃষক, বৈদ্যের দল এই পথ অনুসরণ করেই নিজেদের বিকশিত করেছেন। এঁরা সকলেই ব্যক্তিগত স্তরে পর্যায়ক্রমে শারীরিক ও বৌদ্ধিক চিন্তনে যুক্ত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবন, কৌতুহল এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার এইরকম সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটানো প্রয়োজন।

(পৃষ্ঠা ৫৭)

শিল্প-নন্দনতত্ত্ব-চারুকলা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদির শিক্ষা প্রসঙ্গে ‘রূপরেখা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকলার প্রসঙ্গটি বারবার গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, সুপারিশ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে শিল্পকলা চর্চার বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয় নি।

(পৃষ্ঠা ৫১)

বিচিত্র এবং বিরাট সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ আমাদের শিক্ষার্থীরা। তাদের শৈল্পিক দক্ষতায় পুষ্ট করতে আমরা দায়বদ্ধ। তাদের মনে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি ও মজুত ভাণ্ডারকে সংহত ও ঘনীভূত করতে হবে।...

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জীবন্ত উদাহরণ হল আমাদের শিল্পকলা – একথা স্মরণ রাখতে হবে। শিল্পকলা, তা সে দৃশ্যকলা/প্রদর্শিত কলা হোক আর পরিবেশ কলা যাই হোক না কেন, শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পাঠক্রমে তার উপস্থিতি প্রয়োজন।

শুধু বিনোদন হিসাবে নয়, বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বিকশিত করতে হবে। শিল্পকলার পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থী দেশের সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র শৈল্পিক পরম্পরার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হবে। বিদ্যালয়ে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিল্পকলার শিক্ষা বিষয় চর্চার হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার সুবিধা থাকতেই হবে। নির্দিষ্ট শিল্পকলার চারটি ধারা হিসাবে সঙ্গীত, নৃত্য, দৃশ্যকলা এবং থিয়েটার-সবকটিই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিল্পকলার গুরুত্ব বিষয়ে পিতামাতা বা অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৫২)

থিয়েটার বা নৃত্য বা মাটির কাজ ইত্যাদি কাজের জন্যে



একটানা এক/দেড় ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করত হবে।

শিশুর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি এবং শৈলী যাতে এসব উপাদানে এবং কাজের দক্ষতায় ও কলাকৌশলে প্রকাশিত হয় সেটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর কাজের মান বা 'নিখুঁত' হবার বিষয়টি বড় কথা নয়।

মাধ্যমিকের পর + ২ পরবে যারা বিশেষ কোন শিল্পআঙ্গিকের বিশিষ্ট পাঠ নিয়ে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইচ্ছাপূরণ-এর জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

শিল্পকলার প্রয়োজনীয় উপকরণ সকল শিক্ষকের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ৫৩)

পাঠক্রমের নির্মাণভূমি এবং শিখনের উপাদান

পাঠক্রমের পরিকল্পনার ছক কাটবার জন্যে পাঠ্যপুস্তককেই প্রধান আধার বলে গণ্য করা একটি সরলীকৃত ধারণা।

(পৃষ্ঠা ৮৭)

স্কুল লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা থাকবে যে এটা একটা বোধচর্চার 'জায়গা', যেখানে শিক্ষক, ছাত্র এবং গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা এসে তাঁদের নিজেদের জ্ঞানকে গভীরতর এবং কল্পনাকে প্রসারিত করার মাধ্যম খুঁজে পাবেন।

(পৃষ্ঠা ৮৮)

একমুখী মাল্টিমিডিয়া ও তথ্য সম্প্রসারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের বদলে এদের পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তি করে তুলতে হবে।

(পৃষ্ঠা ১২০)

শিক্ষাগত প্রযুক্তি

শিক্ষাগত প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা যাতে হয় সেজন্য সমস্ত স্তরের স্কুলে ET- র সুযোগ সুবিধাগুলি পৌঁছে যাওয়া খুব জরুরী।

(পৃষ্ঠা ৮৯)

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

আগামী ২০২০ ও ২০৩০ সালের মধ্যে এই রাজ্যের শিক্ষাপদ্ধতি কী হবে তার রূপরেখা তৈরির জন্য যে শিক্ষা কমিশন তৈরি হয়েছে, সেই শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য ক্লাসে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। কমিশনের প্রস্তাবে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে যে এবার থেকে পড়ুয়ারা কম্পিউটার, প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে পড়াশোনা করবে। সাহিত্য পড়ানোর ক্ষেত্রেও ক্লাসেই প্রদর্শিত হবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রগুলির কপি প্রতিটি স্কুলে সংরক্ষিত থাকবে। কমিশনের প্রস্তাবে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে তথ্যপ্রযুক্তির এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে শারীরবিদ্যা, ভূগোল, সৌরজগৎ, অণু- পরমাণুর গঠন ইত্যাদি

'নেট' দেখে বিভিন্ন 'সাইটে' যেসব ভালোমানের অডিও এবং ভিডিও উপাদান আছে সে প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল হয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের জন্য পাঠ্য পুস্তক, ওয়াকিবুক এবং হ্যান্ডবুক তৈরী করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিতেই ধ্রুপদী সিনেমাগুলিকে প্রাপ্তিযোগ্য করা যায়।

(পৃষ্ঠা ৯০)

অন্যান্য 'অবস্থান' এবং 'জায়গা'

স্থানীয় স্মৃতিস্তম্ভ এবং প্রত্নশালা, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আবাস যেমন নদী, পাহাড়, দৈনন্দিন ঘোরাফেরার জায়গা ইত্যাদি সবই পাঠ-প্রক্রিয়ার অংশ।

ক্লাসরুমের কাজকর্মকে যদি শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তবে তা শিশুর স্বাধীন বিকাশের পথে অনাবশ্যিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

(পৃষ্ঠা ৯১)

বিভিন্ন সোসাইটি এবং শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা

স্কুলের নতুন ধারণা এবং আদর্শ সৃষ্টি করায় শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য উপাদানের উন্নতিতে বিভিন্ন NGO গুলির অনেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

(পৃষ্ঠা ১১৩)

(শিক্ষকদের সংগঠনগুলি) গ্রহণযোগ্য একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বিভিন্ন মান তৈরীর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। .. এই ধরনের সংগঠনগুলি আঞ্চলিক স্তরের সংগঠনগুলির সঙ্গে মিশে (BRC/CRC) যৌথভাবে শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয় প্রকৃতি বিশ্লেষণের ও সাহায্য এবং তথ্য সরবরাহের কাজ করতে পারে।

(পৃষ্ঠা ১১৪)

বিষয় পড়ানোর জন্য পাঠ্যক্রমকে অন লাইনে এমন ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে তা আকর্ষণীয় হয় এবং শেখা ও জানার কাজ সহজ হয়। শুধু তাই নয়, পড়াশোনার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ছবি, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা থাকে। সেই সঙ্গে নিচু ক্লাসে হোমওয়ার্ক না দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার পুরোটাই যেন প্রজেক্টর নির্ভর হয়। শুধু মাত্র প্রথম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার ক্ষেত্রে কমিশন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছে তা নয়, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কমিশনের নির্দিষ্ট প্রস্তাব রয়েছে। তবে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের এই সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে সকলের মতামত আহ্বান করা হয়েছে, যাতে মতামতগুলি নিয়ে কমিশন পুনরায় আলোচনা বসতে পারে।

বিদ্যালয়ে প্রদর্শনযোগ্য অডিও-ভিসুয়াল উপাদান

- ১) শরীরটাকে দুর্গ গড়ি - বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচানোর উপায়।
- ২) ওস্তাদ সিং আর মশার গল্প - মশার কামড়ে কীভাবে আমরা অসুস্থ হই এবং তা থেকে বাঁচার উপায়।
- ৩) ওস্তাদ সিং আর কৃমির গল্প - কৃমিজনিত নানারকম রোগ থেকে রেহাই পাওয়ার কৌশল।
- ৪) টিলমারা অভিযান - খোলা জায়গায় পায়খানা করা উচিত নয়।
- ৫) মালার গল্পঃ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একজন কিশোরীর প্রকৃতি, মাটি এবং গাছকে সাথে নিয়ে দাঁতে দাঁত চাপা এক লড়াইয়ের কাহিনী।
- ৬) আনন্দবাবুর বাগানঃ শিশুদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্য কিছু শিক্ষা এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে।
- ৭) ভালো খাও ভালো থাকো - খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত।
- ৮) ফল খাওয়া কত যে ভালো - ফল ও সজীর গুণাগুণ সম্পর্কিত।
- ৯) ছবিতে সবজি - ছবির মাধ্যমে সবজি চেনা।
- ১০) আকাশী - কার্টুনের মাধ্যমে শিশুদের পঞ্চায়েত সম্পর্কে ধারণা।
- ১১) নীলাভ সৌন্দর্যঃ এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে পৃথিবীর ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্ত ঐশ্বর্যগুলি।
- ১২) বইয়ের পাহাড়ঃ আধুনিক পুঁথি এবং তথ্যময় জগতের একজন মানুষ যাকে তুলে আনা হয়ে বই-এর পাহাড়ে এবং তিনি কিভাবে উঠে এলেন চূড়ায় তা নিয়ে এই ছবি।
- ১৩) ঝগড়াঝাটি - বাড়িতে ওষধি বাগানের প্রয়োজনীয়তা।
- ১৪) ম্যানগ্রোভ (বাংলায় ডাবিং) - সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ পরিচিতি ও তার উপযোগিতা।
- ১৫) অ্যানিম্যাল ফার্ম কার্টুন (বাংলায় ডাবিং) -
- ১৬) সাধুতাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ - সব সময় সৎ পথে চলা উচিত।
- ১৭) শৃগাল ও আঙ্গুর ফলের গল্প - নিজের সাধ্যের বাইরে কিছু চাইলে ঠকতে হয়।
- ১৮) ধূর্ত শেয়াল ও বোকা ছাগল - বুদ্ধি থাকলে সব বিপদ থেকেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
- ১৯) দুর্জন বাঘ ও উপকারী বক - লোভের ফাঁদে পড়লে তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।
- ২০) বাঘের চাতুরীর ফল - চাতুরীর দ্বারা কখনও কোনও মহৎ কাজ হয় না।
- ২১) দুঃখী বৃদ্ধ এবং যম - প্রত্যেকের কাছেই তার নিজের জীবন খুব প্রিয়, জীবনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই নিজের মৃত্যু কামনা করে কিন্তু সেটা তাদের মনের কথা নয়, মুখের কথা।
- ২২) দাঁড় কাকের নির্বুদ্ধিতা - নিজের যোগ্যতা বুঝে কোনও কাজে হাত দেওয়া উচিত।
- ২৩) কাপুরুষের আফালন - যারা মুখে শুধু বড় বড় কথা বলে, তাদের সঙ্গে কোনও কাজে গেলে বিপদে পড়তে হয়।
- ২৪) পিঁপড়ে ও পায়রার কাহিনী - বিপদে অন্যের পাশে থাকলে নিজের বিপদেও অপরের সাহায্য পাওয়া যায়।
- ২৫) প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন - একমাত্র বিপদের সময়ই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।
- ২৬) মিনাঃ মেয়েদের যত্ন নাও - ছেলেদের মতন মেয়েদেরও সমান যত্ন নেওয়া উচিত।
- ২৭) মিনার গল্পঃ ভাগ করে খাও আধা আধা - ছেলে ও মেয়েদের সমান সমান খাওয়া উচিত।
- ২৮) মিনা কি স্কুল যাওয়া ছেড়ে দেবে - মেয়েদের শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।
- ২৯) বুদ্ধিমতি মিনা - মেয়েদের কথাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।
- ৩০) মিনার তিনটি ইচ্ছা - শৌচাগার ব্যবহার, নিরাপদ জল ও সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার প্রয়োজনীয়তা।
- ৩১) মিনা ও নিউমোনিয়া - নিউমোনিয়া নিয়ে সাবধানতা।
- ৩২) বামুনের গল্প - অসৎ পথে বড় হওয়া যায় না।
- ৩৩) চোর হল সাধু - ভালোর সাথে মন্দ থাকলে সে ভালো হয়ে যায়।
- ৩৪) লোভী চাকর - কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করা উচিত নয়।
- ৩৫) হাতির আকার - কোনও বিষয়ে জানতে চাইলে তা ভালোভাবে জানা উচিত।
- ৩৬) কানা মামার গল্পের ঝুলি - অতি লোভ ভালো নয়।
- ৩৭) আবোল-তাবোল - গানে-ছবিতে সুকুমার রায়ের ছড়া।
- ৩৮) গোপাল ভাঁড়ের তপস্যা - শিশুদের মনোরঞ্জনমূলক।
- ৩৯) মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প - শিশুদের মনোরঞ্জনমূলক।
- ৪০) নটে, ফটে ও বীরাপ্পান - শিশুদের মনোরঞ্জনমূলক।
- ৪১) গোপাল ও গোবিন্দ - মনোরঞ্জনমূলক গল্প।
- ৪২) পার্টস অফ বডি - এখানে শরীরের বিভিন্ন অংশের কথা বলা হয়েছে। (you tube)
- ৪৩) বিভিন্ন প্রাণীর পরিচিতি - এই ছবিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি এবং নাম। (you tube)
- ৪৪) রোড ক্রসিং - রাস্তা পার হওয়ার নিয়ম এবং রাস্তা পার হওয়ার অতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলি। (you tube)
- ৪৫) খান অ্যাকাডেমী কর্তৃক প্রস্তুত অডিও-ভিসুয়ালগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ উপযোগী। বিশেষত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রস্তুত অডিও-ভিসুয়ালগুলি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ সহায়ক হবে।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মূদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

নবদিশা

শিক্ষাগণে নতুন দিশার সন্ধান



সংকলন ৮। ■ ডিসেম্বর ২০১৫

